রামকৃষ্ণ নীতি-গল্প

'পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে' গ্রন্থমালার সম্পাদক ও
বিবিধ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি. এ (অনার্স)
প্রণীত

[পঞ্চদশ সংস্করণ]

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শত-বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে যখন জগতের তাবৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য দ্বারা এই মহাপুরুষের স্মৃতি-তর্পণ করিলেন, ঠিক সেই সময় এ চিন্তা মনে জাগা স্বাভাবিক যে, বাঙ্গলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি কি এই উৎসবে কোন অংশই গ্রহণ করিবে না? যাহাতে বাঙ্গলার এই সাধকপ্রবরের সহিত ছেলে-মেয়েদের একটু নিবিড় ভাবে পরিচয় হয়, তাহার জন্যই রামকৃষ্ণ নীতি-গল্প বক্ষ্যমাণ আকারে প্রকাশ করা হইল।

প্রভু রামকৃষ্ণদেব বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে উপদেশমূলক গল্পাদি চয়ন করিয়া, রূপে রসে তাহাদের নূতনত্ব বিধান করিয়া, আপন বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় শিষ্যদের নিকট বিবৃত করিতেন। সেই সকল গল্পের মধ্যে যেগুলি শিশুদের সুবোধ্য এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্র সুগঠিত করিবার পক্ষে সবিশেষ উপযোগী, সেইগুলি একত্রিত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইল।

রামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে সঙ্কলিত এই গ্রন্থোক্ত নীতি-গল্পগুলি প্রাত ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক পঠিত হউক,—যে অমৃতের আস্বাদন পাইয়া পিতৃ-পিতামহগণ ধন্য হইয়াছেন, তাহা ছোটদেরও ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের সহায়ক হউক, ইহাই কামনা।

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

ইতি
বিনীত—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

সূচিপত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম, বোধ হয়, তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বাঙ্গলা দেশে তাঁহার মত সাধক খুব কমই জন্মিয়াছেন। হিন্দুর পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ ও লোক-প্রবাদ হইতে তিনি নানা নীতি-গল্প সংগ্রহ করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে শুনাইতেন—যাহাতে সহজে তাঁহাদের ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ও সুনীতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা হয়। সেই গল্পেরই কয়েকটি তোমাদের জন্য সরল ভাষায় প্রকাশিত হইল।

কলিকাতার ঠিক উত্তর দিকে দক্ষিণেশ্বরে এক কালীবাড়ী আছে, রামকৃষ্ণদেব ছিলেন সেই কালীবাড়ীর পুরোহিত। তিনি এতখানি ভক্তির সহিত মা-কালীর পূজা করিতেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। ঠাকুরবাড়ীর যেখানে সেখানে যখন তখন ধূলায় পড়িয়া তিনি 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। পরে তিনি গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া সাধনার উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছে। তোমরা বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনিয়াছ। তিনি পরমহংসদেবের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশগুলি দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও সাধনা সার্থক করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যরা দেশের সর্ব্বত্র 'রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম', 'রামকৃষ্ণ-মঠ'

প্রভৃতি লোকহিতকর-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আৰ্ত্ত, দুঃস্থ, সহায়-সম্বলহীনদের সেবা ও সাহায্য করাই এই সকল আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব-দুৰ্ব্বিপাকে বিপন্ন নরনারীর সাহায্য করিতে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের এই সকল সাধুরা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন।

(রামকৃষ্ণদেব ১২৪২ সালের ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন।) তাঁহার জন্মের শত-বার্ষিকী উৎসব সর্ব্বত্র মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার ভক্ত-বৃন্দ রহিয়াছেন, সুতরাং এই উৎসব পৃথিবীব্যাপী হইয়াছিল।

এই মহাপুরুষ-বর্ণিত গল্প ও উপদেশ পড়িতে তোমাদের ভাল লাগিবে। কিন্তু শুধু পড়িবার জন্য বা সময় কাটাইবার জন্য পড়িলে হইবে না,—যদি এই উপদেশগুলি মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া সেইমত কাজ করিবার সঙ্কল্প কর, তাহা হইলে এই শতবার্ষিকী উৎসবান্তে তোমাদেরই হইবে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা-নিবেদন।

রামকৃষ্ণ নীতি-গল্প

—— ❋ ——

নারদের অহঙ্কার

নারদ ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র ও একজন বিখ্যাত ঋষি। ত্রিভুবনে দিনরাত তিনি হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইতেন। একবার নারদের মনে ভারি অহঙ্কার হইল—তাঁহার মত হরিভক্ত বুঝি আর কেহ কোথাও নাই। ভগবান সবই জানিতে পারেন, তাঁহার কাছে লুকান কিছুই থাকে না; কাজেই নারদের এই অহঙ্কারের সংবাদটুকুও তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নারদ, পৃথিবীতে আমার একজন বড় ভক্ত আছে,—তাহার চেয়ে খাঁটি ভক্ত আমার আর কেহ নাই। তোমার একবার তাহাকে দেখিয়া আসা উচিত।"

ভগবান হরির এই কথা শুনিয়া নারদের মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল।....ভগবান এ কি বলিতেছেন? আমি দিনরাত কেবল হরিগুণ গাহিয়া বেড়াই, আমার চেয়ে তাঁহার আর বড় ভক্ত কে থাকিতে পারে? লোকটিকে একবার দেখিয়া আসা উচিত ত!

নারদ ভগবানের কথামত সেই লোকটিকে দেখিবার জন্য তখনই যাত্রা করিলেন। পৃথিবীতে নামিয়া অনেক গ্রাম-নগর পার হইয়া, শেষে নারদ সেই ভক্তের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নারদ সেখানে আসিয়া দেখিলেন, ভগবান যাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, সে একজন গরীব চাষা— সকালে একবার 'শ্রীহরি' বলিয়া হাল-গরু লইয়া মাঠে চলিয়া যায়, তারপর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে এবং রাত্রিতে আবার একবার 'শ্রীহরি' বলিয়া ছেঁড়া মাদুরখানিতে শুইয়া পড়ে।

নারদ তো একেবারে অবাক।....আমি দিনরাত হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইতেছি, আমি হইলাম না ভগবানের খাঁটি ভক্ত,—আর এই চাষা কিনা তাঁহার খাঁটি ভক্ত। ভগবানের উপর নারদের বেশ একটু অভিমান হইল। নারদ বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, এ তোমার কেমন বিচার হইল? আমি দিনরাত তোমার নাম লইয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াই, আমি তোমার যথার্থ ভক্ত হইলাম না, আর সেই চাষাটা, যে দিনরাতের মধ্যে কেবল দুইবার তোমার নাম স্মরণ করে. সেই হইল কিনা তোমার যথার্থ ভক্ত?"

ভগবান নারদের এ কথার কোন উত্তর দিলেন না; তিনি এক ভাঁড় তৈল আনিয়া নারদের হাতে দিয়া বলিলেন,— "নারদ, এই তৈলের ভাঁড়টা তুমি কৈলাসে দিয়া আইস। কিন্তু সাবধান, দেখিও যেন এক ফোঁটা তৈল মাটিতে না পড়িয়া যায়।"

নারদকে খুব সাবধানে ভাঁড়টি লইয়া
কৈলাসে যাত্রা করিতে হইল।

নারদ ভগবান হরির নিকট হইতে তৈলের ভাঁড়টি লইলেন। ভাঁড়টি কানায় কানায় তৈলে ভরা ছিল। হাত একটু নড়িলেই তৈল মাটিতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা; কাজেই নারদকে খুব সাবধানে তৈলের ভাঁড়টি লইয়া কৈলাসে যাত্রা করিতে হইল। পরদিন নারদ যখন তৈলের ভাঁড়টি কৈলাসে দিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি নারদ, কাল তুমি কত বার আমার নাম স্মরণ করিয়াছিলে?"

ভগবানের কথার উত্তরে নারদ বিরক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"নাও ঠাকুর, কাল কি আর তোমার নাম স্মরণ করিবার সময় পাইয়াছি? তুমি যে তৈলের ভাঁড় দিয়াছিলে, তাহা সামলাইতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।"

নারদের কথা শুনিয়া ভগবান মৃদু হাসিলেন, বলিলেন,— "নারদ, তুমি একটা তৈলের ভাঁড় সামলাইতেই এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলে যে সমস্ত দিনরাত্রির ভিতর একটি বারের জন্যও আমার নামটা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবার অবসর পাইলে না; আর সেই চাষা দিনরাত সংসারের শত যন্ত্রণার ভিতর থাকিয়াও অন্ততঃ দুইবার আমাব নাম স্মরণ করিতে একদিনের জন্যও ভুল করে না। তবেই বল দেখি, তাহার মত ভক্ত আমার আর কে আছে?"

শ্রীহরির কথা শুনিয়া নারদ লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অহঙ্কারটুকু চিরজীবনের মত মন হইতে মুছিয়া গেল।

কে কত বার ভগবানকে ডাকে, তাহা দ্বারা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তখনই, যখন সংসারের শত বাধা-বিঘ্ন ও প্রলোভনের মধ্যেও ভক্ত ভগবানকে ভুলিয়া যায় না।

বামুনের গো-হত্যা

এক দেশে এক বামুন ছিলেন। তাঁহার বাগ্‌-বাগিচার দিকে বড় ঝোঁক ছিল। বামুন নিজের হাতে এমন একটি সুন্দর বাগান করিয়াছিলেন যে, তেমন বাগান এদেশে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কোন ভাল ফলের গাছ ছিল না যাহা বামুন তাঁহার বাগানে লাগান নাই।

একদিন একটা গরু সেই বাগানের ভিতর ঢুকিয়া বামুনের একটি বড় শখের কলমের আম-গাছ একেবারে মুড়াইয়া খাইয়া ফেলিল। বামুন তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া অপর একটি গাছের গোড়া নিজের হাতে পরিষ্কার করিতেছিলেন। গরুটা তাঁহার সেই বড় সাধের কলমের চারাটা খাইয়া ফেলায় বামুন আর কিছুতেই রাগ সামলাইতে পারিলেন না,—সম্মুখেই একটা শাবল পড়িয়াছিল, তিনি সেইটি তুলিয়া গরুটার দিকে সজোরে ছুঁড়িলেন। গরুটাকে আর এক পাও নড়িতে হইল না, এক আঘাতে সে সেইখানে পড়িয়া ছটফট করিয়া মরিয়া গেল।

বামুন গরু মারিয়াছে, এ-কথাটা শীঘ্রই গ্রামের ভিতর রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একে তো গরু-মারা মহাপাপ—তাহার উপর বামুন হইয়া গরু মারা,—সে পাপের ত আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। গ্রামের লোক সকলে মিলিয়া বামুনকে একঘরে করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। বামুন এই মহাবিপদে পড়িয়া অন্য উপায় না দেখিয়া বলিলেন,—

"গরু আমি মারিয়াছি কে বলিল ? গরু ত আমি মারি নাই ;—আমার এই হাত মারিয়াছে। আর হাতেরও আমি অপরাধ দিতে পারি না, কারণ হাতের কি ক্ষমতা ? এই হাতখানি নাড়াইতেছেন, ফিরাইতেছেন যিনি, তাঁহার ইচ্ছাতেই এই হাত গরু মারিয়াছে। যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ত সে অপরাধ তাঁহার। অর্থাৎ এ অপরাধের জন্য দায়ী ভগবান—আমিও নই, আমার হাতও নহে।"

বামুন ভগবানের উপর সমস্ত অপরাধ চাপাইয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইলেন। ভগবান এই কথা জানিতে পারিয়া এক থুড়থুড়ে বুড়ো বামুনের বেশ ধরিয়া একদিন সেই বামুনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। বামুন তখন বাগানের ভিতরেই পায়চারি করিতেছিলেন। ভগবান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপু, এ বাগানটি কার ?"

বামুন তখনই উত্তর দিলেন,—"আমার !"

ভগবান বলিলেন,—"বাঃ, তোমার বাগানটি ত বেশ সুন্দর ! কি সুন্দর সারবন্দি করিয়া গাছগুলি রোপণ করা হইয়াছে ! তোমার মালী দেখিতেছি বড়ই কাজের লোক।"

বামুন উত্তর দিলেন,—"মালীটালী আমার কেহ নাই, আমি নিজেই এই সব পুঁতিয়াছি।"

ভগবান বলিলেন,—"তাই নাকি! তাহা হইলে তুমি ত একজন গুণী লোক! এ রাস্তাটিও বড় চমৎকার হইয়াছে—এটিও কি, বাপু, তুমিই করিয়াছ?"

ভগবানের কথায় বামুনের ভিতরটা আত্ম-গরিমায় ফুলিয়া উঠিযাছিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"মহাশয়, এ বাগানে যাহা কিছু দেখিতেছেন সবই আমার তৈযারী। এ রাস্তাও আমি নিজে করিয়াছি।"

বামুনের কথায় ভগবান মনে মনে হাসিতেছিলেন। বামুনের কথাটা শেষ হইবামাত্র তিনি বলিলেন,—"ঠাকুর, সবই যখন তুমি করিয়াছ তখন গরু মারিবার জন্যই কি ভগবান বেচারী দায়ী?"

বামুনের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

ভাল কাজগুলির বেলায় যখন নিজের বলিয়া বাহাদুরি করিতে ছাড না, তখন অন্যায় কাজগুলির জন্যই বা ভগবান দায়ী হইতে যাইবেন কেন?

———

সাপ ও সন্ন্যাসী

এক গ্রামের নিকট এক মাঠে একটা প্রকাণ্ড সাপ এক গর্ত্তের ভিতর বাসা করিয়াছিল। সাপটার আকার যেমন প্রকাণ্ড, স্বভাবটি ছিল আবার তেমনি ভয়ঙ্কর। তাহার ভয়ে গ্রামের লোক সেই মাঠের ত্রিসীমানায় যাইতে সাহস করিত না। যদি কোন লোক না জানিয়া সেই মাঠের নিকট যাইয়া পড়িত, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা ছিল না,—সাপটা অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া দিত।

সেই মাঠের পাশেই রাখাল-ছেলেরা গরু চরাইত। যদি অন্য গ্রামের কাহাকেও সেই মাঠের দিকে যাইতে দেখিত, অমনি তাহারা সাপের কথা বলিয়া তাহাকে সেদিকে যাইতে নিষেধ করিত। একদিন রাখালেরা গরুর পাল লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় দেখিল, একজন সন্ন্যাসী সেই মাঠের দিকে যাইতেছেন। অমনি একজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিল,— "ঠাকুর, ও দিকে যাইবেন না, ও দিকে যাইবেন না। ঐ মাঠে একটা প্রকাণ্ড সাপ আছে। সাপটা বড় পাজী—মানুষের শব্দ পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া কামড়ায়।"

রাখাল-বালকের কথায় সন্ন্যাসী একটু থামিলেন, পরে গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বৎস! আমি সন্ন্যাসী, আমি সাপের ভয় রাখি না। সাপের এমন শক্তি নাই যে, আমাকে কামড়াইতে পারে।" সন্ন্যাসী আর বিশেষ কোন কথা

কহিলেন না ; একটু মৃদু হাসিয়া, সেই মাঠের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী তাহাদের কথা না শুনিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া, রাখাল-ছেলেদের আর গ্রামে ফেরা হইল না, সাপটা কি করে দেখিবার জন্য গরুর পাল লইয়া তাহারা পাশের মাঠটার ধারে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী মাঠে যাইবামাত্র সাপটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসীকে কামড়াইতে আসিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার দিকে চাহিবামাত্র তাহার গর্জ্জন বন্ধ হইয়া গেল, সে আর ফণা তুলিতে পারিল না—মড়ার মত সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ঢলিয়া পড়িল। তখন সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে সাপটাকে বলিলেন,—

"কি হে বন্ধু, আমাকে কামড়াইতে আসিয়াছিলে, কামড়াও।"

সাপটার তখন এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সে আর লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না ;—তাহার ফণা উঁচু করিবার শক্তিটুকুও কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে! সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,—

"বন্ধু, তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখন কাহাকেও কামড়াইবে না, তাহা হইলে আমি তোমাকে তোমার আগেকার শক্তি ফিরাইয়া দিতে পারি।"

সাপ মশাই তখন করেন কি, অন্য উপায় ত আর নাই! বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, সে আর ভবিষ্যতে কাহাকেও কামড়াইবে না। সন্ন্যাসী তখন তাহার সর্ব্বশক্তি ফিরাইয়া দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন,

আর সাপ মহাশয়ও সুড় সুড় করিয়া নিজের গর্ত্তের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—কাজেই সাপ আর কোন মানুষকে কামড়ায় না, সে অতি ভদ্রভাবে জীবন কাটাইতে লাগিল। সাপটার এই ভাব দেখিয়া রাখাল-ছেলেরা তাহাকে দেখিতে পাইলেই ঢিল মারিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তবুও সাপটা ফণা পর্য্যন্ত তুলে না দেখিয়া তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা একদিন সাপটার লেজ ধরিয়া এমনি ঘুরণ ঘুরাইল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। কিন্তু তবুও সে কাহাকেও কিছু বলিল না, কোনমতে প্রাণটুকু লইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

ইহার কিছুকাল পরে সন্ন্যাসী আবার একদিন সেই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাপটির দুরবস্থা দেখিয়া করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্ধু, তুমি এমন অস্থিচর্ম্মসার কেমন করিয়া হইলে? তোমার কি কোন অসুখ-বিসুখ করিয়াছে?"

সাপ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"আমার অসুখ-বিসুখ কিছুই করে নাই, ঠাকুর। আপনার আদেশ মত আমি আর মানুষকে কামড়াই না,—তাই তাহারা আমার এই হাল করিয়াছে। সেদিন ছেলেরা লেজ ধরিয়া এমন ঘুরণ ঘুরাইয়াছে যে, আমার সর্ব্বাঙ্গের হাড় চুরমার হইয়া গিয়াছে।"

সাপের এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন; তিনি মিষ্ট স্বরে বলিলেন,—"ভাই, আমি তোমাকে কামড়াইতে

নিষেধ করিয়াছি বটে, কিন্তু ফোঁস করিতে তো বারণ করি নাই। যখন তাহারা মারিতে আসিত, তখন ফণা তুলিয়া ফোঁস কর নাই কেন? তাহা হইলে তো তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না। লোকের অনিষ্ট করিও না, কিন্তু লোকেও যাহাতে তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে, সেজন্য তোমার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পরদিন রাখালের ছেলেগুলি সেই মাঠে আসিবামাত্র সাপ ফণা তুলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তখন তাহারা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। সেই হইতেই সাপটি আবার নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিল।

ঘণ্টাকর্ণ

এক দেশে এক লোক ছিল, সে দিনরাত কেবল শিবেরই আরাধনা করিত। তাহার মত শিব-ভক্ত লোক সচরাচর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। সে যথার্থই শিবকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিত, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—তাহার চরিত্রে একটা মহাদোষ ছিল যে, সে অপর কোন দেবতাকেই মানিত না। ভক্তি করা তো দূরের কথা, বরং তাঁহাদের সে মনে মনে ঘৃণা করিত।

লোকটির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন শিব তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন,—"দেখ বাপু, সব দেবতাই এক, কাজেই একজনকে ঘৃণা করিলে সব দেবতাকেই ঘৃণা করা হয়। তুমি যত দিন পর্য্যন্ত না অন্যান্য দেবতাদের ভক্তির চক্ষে দেখিবে, তত দিন পর্য্যন্ত তুমি কিছুতেই আমাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।"

শিব লোকটিকে এই কয়টি কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু তবুও লোকটির চৈতন্য হইল না। সে পূর্ব্বেও যেমন অপর দেবতাদিগকে ঘৃণা করিত, এখনও তেমনি ঘৃণা করিতে লাগিল। শিবের কথাগুলিতে কোন ফল ত হইলই না, বরং উল্টা ফল হইল। পূর্ব্বে সে প্রকাশ্যভাবে কোন দেবতারই নিন্দা করিত না; কিন্তু শিবের আগমনের পর হইতে সে প্রকাশ্যভাবেই তাঁহাদের নিন্দা করিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরে শিব আবার একবার হরিহর-মুর্ত্তিতে আসিয়া তাহাকে দেখা দিলেন। লোকটা হরের পার্শ্বে হরির মূর্ত্তি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে হরির মূর্ত্তির দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না,—কেবল হরের পূজা করিল। লোকটার এই ব্যবহারে শিব বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তখনি তাহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

লোকটার এই গোঁড়ামির কথা শীঘ্রই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেশের ছেলেরা তাহাকে দেখিলেই 'শ্রীবিষ্ণু' 'শ্রীবিষ্ণু' বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল। লোকটা এমনই শিবের গোঁড়া ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে ছেলেদের 'শ্রীবিষ্ণু'

চীৎকার তাহার একেবারে অসহ্য হইল। বিষ্ণুর নামটা সে কানে শুনিতেও নারাজ। ছেলেদের 'শ্রীবিষ্ণু' চীৎকারের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সে এক মতলব আঁটিল; তাহার

অমনি ঘণ্টা দুইটা ঢন্ ঢন্ শব্দে বাজিয়া উঠিত।

দুই কানে দুইটা বড় বড় ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিল। যখনই ছেলের দল 'শ্রীবিষ্ণু' বলিয়া চীৎকার করিত, অমনি সে সবলে তাহার মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিত। আর ঘণ্টা দুইটা ঢন্ ঢন্ শব্দে বাজিয়া উঠিত, তখন 'শ্রীবিষ্ণু'র নাম তাহার কর্ণে আর প্রবেশ করিত না। লোকে তাহার পর হইতে তাহার নাম রাখিল 'ঘণ্টাকর্ণ'।

তাহার গোঁড়ামির জন্য সে আমাদের চক্ষে এমন ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিয়াছে যে আজও আমাদের দেশের ছেলেরা ফাল্গুন-মাসের সংক্রান্তিতে এই ঘণ্টাকর্ণের মূর্ত্তি গড়িয়া লাঠি দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে।

ধর্ম্মের গোঁড়ামি মহাপাপ। সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে—যে তাহা না দেখে সে কখনও ধার্ম্মিক নয়!

ব্রাহ্মণ ও ভাগবত

এক রাজ-সভায় এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আমি ভাগবতে সুপণ্ডিত। আমি আপনাকে কিছু ভাগবতের কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বেশ ভাল রকমই জানিতেন যে, যিনি ভাগবতে সুপণ্ডিত হইবেন, যিনি ভাগবত বুঝিবেন, তাঁহার সমস্ত প্রাণ ভগবানের জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে—তিনি সামান্য ধন-সম্মানের লোভে রাজসভায় কখনই আসিবেন না। ব্রাহ্মণের

কথার উত্তরে তাই রাজা বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, ভাগবত এখনও আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই। বাড়ী যান,—বাড়ী গিয়া আগে ভাগবত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করুন। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি, ভাগবত যখন আপনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার মুখে ভাগবত শুনিব।"

রাজার এই উত্তরে ব্রাহ্মণ মনে ভাবিলেন, রাজাটা কি নির্বোধ! আমি আজ এত বৎসর ধরিয়া ভাগবত পড়িলাম, আর রাজা কিনা অনায়াসে বলিলেন, আমার এখনও ভাগবত সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ দুঃখিত মনে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর অতি মনোযোগের সহিত আর একবার তিনি ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন এবং যথাসময়ে আবার রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে আবার রাজসভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া রাজা আবার সেই একই উত্তর দিলেন,—"ব্রাহ্মণ, আপনার এখনও ভাগবত সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই।"

রাজার আচরণে ব্রাহ্মণ এবার বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, রাজা তাঁহার সহিত এরূপ আচরণ করিতেছেন কেন?—নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কোন না কোন অর্থ আছে। ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরিয়া গৃহের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ভাগবত লইয়া বসিলেন এবং আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবলই ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে একমনে কিছুদিন ভাগবত পাঠ করিতে করিতেই ভাগবতের ভিতরকার সারতত্ত্বসকল তাঁহার প্রাণের ভিতর ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লোভ, দম্ভ,

ক্ষোভ, কামনা সবই ধুইয়া মুছিয়া একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। রাজার নিকট যাইবার কথা আর একবারের জন্যও তাঁহার প্রাণের ভিতর উদয় হইল না; তখন হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া, দিনরাত কেবল তাঁহারই আরাধনা করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ফিরিলেন না দেখিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন একবার দেখিয়া আসা উচিত। রাজা স্বয়ং একদিন ব্রাহ্মণের কুটিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন স্বর্গের জ্যোতিঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, এতদিনে ভাগবত আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার শিষ্য করুন!"

ব্রাহ্মণের তখন ধ্যান ভাঙ্গিল, কিন্তু রাজার কথার তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির উপর তখন আর তাঁহার লোভ ছিল না।

উপর উপর পাঠ করিলে কেবল তোতাপাখী হয়, তাহাতে মানুষ জ্ঞানী হইতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানী হইতে গেলে, ভিতরকার মূল কথা জানিতে হয়। তাহা জানিলে কেবল জ্ঞানলাভ নয়, জীবনের গতিই বদলাইয়া যায়।

চারি অন্ধ

এক গ্রামে চারিটি জন্মান্ধ বাস করিত। সেই গ্রামের জমিদার একটি হাতী ক্রয় করিয়া আনিলেন। গ্রামের অনেকেই হাতী দেখে নাই,—জমিদারের হাতী আসিবামাত্র দলে দলে লোক হাতী দেখিতে আসিল। গ্রামের জমিদার যে এক হাতী আনিয়াছেন, সেই অন্ধ চারিজনও সে কথা শুনিল। হাতীর মত বড় জানোয়ার পৃথিবীতে আর নাই— অন্ধ চারিজনেরও হাতী দেখিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু চক্ষু নাই, কেমন করিয়া হাতী দেখিবে? হাতের দ্বারা স্পর্শ করিয়া যতটুকু বোঝা সম্ভব, তাহারা কেবল ততটুকু বুঝিল। বাড়ী আসিয়া, যে হাতীর পায়ে হাত দিয়াছিল, সে বলিল,— "হাতীটা ঠিক একটা থামের মত।"

দ্বিতীয় অন্ধ হাতীর শুঁড়টা স্পর্শ করিয়াছিল; সে বলিল,— "হাতী থামের মত কেন হইবে? ঠিক একটা গদার মত।"

তৃতীয় অন্ধ হাতীর পেটে হাত দিয়াছিল; সে বলিল,— "হাতীটা থামের মতও নহে, গদার মতও নহে—হাতীটা একটা মস্ত থলির মত।"

চতুর্থ অন্ধ হাতীর কেবল একটি কান স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল; সে বলিল,—"আমার তো মনে হয়, হাতীটা একটা মস্ত বড় কুলার মত।"

এই লইয়া চারি অন্ধ মহা তর্ক জুড়িয়া দিল—কেহ কাহারও কথা মানিতে চাহে না। যে হাতীর যে অংশটি স্পর্শ করিয়াছে, সেইরূপই হাতীটার পরিচয় দিতে লাগিল। সেই সময় একটি ভদ্রলোক সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। চারিটি অন্ধ পরস্পর কি জন্য এত তর্ক করিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য তিনি তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের তর্কের বিষয় বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—"বাপু, তোমরা কিসের জন্য এত তর্ক করিতেছ, বল ত?"

ভদ্রলোকটির প্রশ্নের উত্তরে চারিটি অন্ধ আগাগোড়া সমস্ত কথা বলিয়া বলিল,—"মহাশয়, আমরা আপনাকেই মধ্যস্থ মানিতেছি। বলুন তো, হাতীটা কিরূপ?"

ভদ্রলোক বলিলেন,—"বাপু, তোমরা শুধু শুধুই তর্ক করিতেছ। হাতী কিরূপ তোমরা কেহই জান না। মোটের উপর হাতী থামের মতও নহে, থলির মতও নহে, গদার মতও নহে, কুলার মতও নহে। তবে হাতীর পাগুলো থামের মত, শুঁড়টা গদার মত, পেটটা থলির মত, আর কান দুইটা কুলার মত। এই সবগুলো এক করিলে যেমন দেখিতে হয়, হাতী অবশ্য কতকটা তেমনি দেখিতে।"

পৃথিবীতে মানুষও ভগবান সম্বন্ধে ঠিক এইভাবে তাঁহার রূপ লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত তর্ক করে। যে যেভাবে ভগবানকে কল্পনা করে, ভগবান সেইরূপ—সে বলিতে চায়।

কার্ত্তিক

একে কার্ত্তিক ভগবতীর ছোট ছেলে, তাহার উপর তিনি ছিলেন আবার দেবতাদের সেনাপতি। কাজেই স্বর্গে কার্ত্তিকের খাতির খুব বেশী ছিল। একদিন কার্ত্তিক দেব-সভা হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন, পথে আসিতে আসিতে দেখিলেন, একটা বিড়াল তাহার সম্মুখ দিয়া রাস্তাটা পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কার্ত্তিকের বয়স তখন অল্প, ছেলেমানুষি তাঁহার তখনও যায় নাই। বিড়ালটাকে দেখিয়া কার্ত্তিকের কেমন মনে হইল, বিড়ালটাকে রাস্তা পার হইয়া যাইতে দিবেন না। এই কথাটা মনে হইবামাত্র তিনি বল্লম দিয়া বিড়ালটাকে একটু খোঁচা মারিলে বিড়ালটা মিউ মিউ করিতে করিতে যেদিক দিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই দিকেই ফিরিয়া গেল। কার্ত্তিক যেমন প্রফুল্ল মনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তেমনি প্রফুল্ল মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

কার্ত্তিক বাড়ী আসিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন—তাহার মায়ের মুখের খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ভগবতীর মুখের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ মা, তোমার মুখের উপরটা অমন ভাবে কেমন করিয়া ছিঁড়িয়া গেল?"

ভগবতী মৃদু স্বরে বলিলেন,—"বাবা, এ তোমারই বল্লমের আঘাত।"

মায়ের কথা শুনিয়া কার্ত্তিকের বিস্ময়ের আর সীমা

কার্ত্তিক একেবারে অবাক হইয়া গেলেন

রহিল না; তিনি আবার বলিলেন,—“সে কি মা! আমি তোমায় কখন আঘাত করিলাম ?”

ভগবতী বলিলেন,—“বাবা, তুমি আমায় আঘাত কর নাই সত্য, কিন্তু তুমি আজ বাড়ী ফিবিবার সময় একটা বিড়ালকে তোমার বল্লমের দ্বারা খোঁচা দিয়াছিলে না ?”

বিড়ালের কথাটা কার্ত্তিক ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, মায়ের কথায় সে কথাটা আবার মনে পড়িল। তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—“হাঁ মা, আমি আসিবার সময় একটা বিড়ালকে বল্লমের খোঁচা মারিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তোমার সহিত উহার সম্বন্ধ কি! তাহাতে তোমার মুখ এমনভাবে ছিঁড়িয়া যাইবে কেন ?”

ভগবতী স্নেহভরে বলিলেন,—“বাবা, সমস্ত প্রাণীই আমার সন্তান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই আমি ছড়াইয়া রহিয়াছি। তুমি যাহাকেই আঘাত কর, সে আঘাত আমাকেই লাগে।”

মায়ের এই কথা শুনিয়া কার্ত্তিকের চৈতন্য হইল। সেই হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর কখনও কাহাকেও অনর্থক আঘাত করিবেন না।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ

আমি শ্রীকৃষ্ণকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি করি—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অর্জ্জুনের মনে বেশ একটু অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। ভগবান অন্তর্য্যামী—তিনি তখনই সেই কথাটা জানিতে পারিলেন। অহঙ্কারের চেয়ে বড় দোষ মানুষের আর কিছুই নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন—"চল অর্জ্জুন, একটু বেড়াইয়া আসি।"

দুই সখায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই অর্জ্জুন দেখিলেন—একজন ব্রাহ্মণ শুক্‌নো ঘাস খাইতেছেন, অথচ তাঁহার কোমরে একখানা তলোয়ার ঝুলিতেছে। ব্রাহ্মণ শুক্‌নো ঘাস কেন খাইতেছেন, তাহা বুঝিতে অর্জ্জুনের বিলম্ব হইল না। অর্জ্জুন বুঝিলেন, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; তাজা ঘাসের প্রাণ আছে, তাই শুক্‌নো ঘাস খাইতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের কোমরে তলোয়ার বাঁধা রহিয়াছে কেন অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সখা, এ কি রকম! পাছে প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয় সেইজন্য এই ব্রাহ্মণ শুক্‌নো ঘাস খাইতেছেন, অথচ ইঁহার কোমরে তলোয়ার ঝুলিতেছে কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথায় বলিলেন,—"তাই ত সখা, চল, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেই সব জানিতে পারা যাইবে।"

একজন ব্রাহ্মণ শুক্‌নো ঘাস খাইতেছেন, অথচ তাঁহার কোমরে
একখানা তলোয়ার ঝুলিতেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামত অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ, পাছে প্রাণীর প্রাণে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় তুমি শুকনো ঘাস খাইতেছ, অথচ তোমার কোমবে অস্ত্র কেন ·"

ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনেব দিকে চাহিলেন, তাহার পরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি চারিটি লোককে সাজা দিব বলিয়া তলোয়ার রাখিয়াছি। যদি কখনও তাহাদের দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহাদেব আর কিছুতেই রক্ষা নাই।"

অর্জ্জুন ব্রাহ্মণেব কথায় অবাক হইয়া গিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"সে চারিজন লোক কে ?"

ব্রাহ্মণ উত্তব দিলেন,—"প্রথম হইতেছে দুষ্ট নারদ।"

"তাঁহার অপরাধ ?"

ব্রাহ্মণ রাগে চোখ দুইটা কট্‌মট্‌ করিয়া বলিলেন,—"তাহাব অপরাধ ? তাহার অপরাধ ভয়ঙ্কব! সে আমার প্রভুর নিকট দিনরাত গান গাহিয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিতেছে। তাহার জ্বালায় ভগবান এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারেন না।"

"দ্বিতীয় লোকটি কে ?"

"দ্রৌপদী!"

"তাঁহার অপরাধ ?"

"তাহার অপরাধও বড় কম নয়। দেখ তাহার আস্পর্দ্ধা, প্রভু আমার আহারের জন্য যাইতেছিলেন, সেই সময়ে কি না সে তাঁহাকে ডাকিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য খাওয়া ফেলিয়া

তখনই ঠাকুরকে কাম্যবনে ছুটিতে হইল। শুধু কি তাই—তারপর সে কি না আমার প্রভুকে তাহার উচ্ছিষ্ট খাবার খাইতে দিল! এত বড় অপরাধের পর কি আমি তাহাকে সাজা না দিয়া স্থির থাকিতে পারি!"

"তৃতীয়টি কে?"

"তৃতীয়টি হইতেছে প্রহ্লাদ। সে ছোঁড়ারও আস্পর্দ্ধা বড় কম নয়। সে অনায়াসে আমার প্রভুকে গরম তৈলের কড়ার ভিতর প্রবেশ করিতে, হাতীর পায়ের নীচে পড়িতে, এমন কি থামের ভিতর ঢুকিতে আদেশ করিল—তাহার একটুকুও সঙ্কোচ হইল না।"

অর্জ্জুন অবাক হইয়া গিয়াছেন; তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চতুর্থ লোকটি কে?"

ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ অর্জ্জুন!"

"তাহার অপরাধ?"

"তাহার অপরাধ সব চেয়ে বেশী। সে কি না আমার ঠাকুরকে দিয়া নিজের রথ চালাইয়া লইল—এত বড় আস্পর্দ্ধা তাহার!"

ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণের ভক্তি দেখিয়া আপনা হইতে অর্জ্জুনের মাথা নত হইয়া পড়িল। সেদিন হইতে তাঁহার সমস্ত অহঙ্কার ধুইয়া মুছিয়া একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল।

অহঙ্কার বড় পাপ। অহঙ্কারের মত ধর্ম্মপথে বাধা আর

নাই। যতক্ষণ বিন্দুমাত্র অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ কেহ প্রকৃত ভক্ত বা ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হয় না।

চাষার প্রতিজ্ঞা

এক দেশে একবার ভীষণ অজন্মা হইয়াছিল। বহুকাল বৃষ্টি না হওয়ায় জলের অভাবে ক্ষেতের ফসল শুকাইতে আরম্ভ করিল। দুইদিনের মধ্যে জল না পাইলে কোন ফসলেরই ফলিবার আশা রহিল না। নালা কাটিয়া নদী হইতে ক্ষেতে জল আনিবার জন্য সকল চাষাই ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং ভোর হইতে না হইতে কোদাল লইয়া ক্ষেতে যাইয়া নালা কাটিতে সুরু করিয়া দিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সকলেই স্নান-আহার করিবার জন্য বাড়ী ফিরিল, কিন্তু একজন চাষা তাহার ফসলগুলি বাঁচাইবার জন্য স্নান-আহার ভুলিয়া গেল, বেলার দিকেও চাহিল না; নদীর জল ক্ষেতে আনিবার জন্য ক্রমাগতই নালা কাটিয়া চলিল। এদিকে সেই চাষার স্ত্রী, দুপুর বাজিয়া গেল তবুও স্বামীকে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া, মেয়ের হাতে বাঁশের চোঙায় করিয়া তেল মাঠেই পাঠাইয়া দিল। চাষার মেয়ে মাঠে আসিয়া বলিল,—"বাবা, দুপুর যে বাজে। মা তেল পাঠাইয়া দিয়াছে। তেল মাখিয়া স্নান করিতে যাও।"

চাষা তখনও নালা কাটিতেছিল; সে কন্যার কথার উত্তরে

আজ এখনও কি স্নান করিবার বেলা হয় নাই ?

বলিল,—"মা, আজ ক্ষেতে জল আনিতে না পারিলে ফসল একটিও বাঁচিবে না—ক্ষেতে জল আনা চাই-ই। এখন আমার খাওয়া-দাওয়ার সময় নাই।"

দুইটা বাজিয়া গেল, তবুও সেই চাষার স্নান-আহারের কথা মনে পড়িল না। বেলা যতই বাড়িতেছিল, তাহার স্ত্রীও ততই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। রান্নাবান্না সমস্তই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সে আর কতক্ষণ এমনভাবে ভাত কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবে? বসিয়া বসিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া সে নিজেই স্বামীকে ডাকিবার জন্য ক্ষেতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া একটু রুক্ষস্বরে বলিল,—

"বলি হ্যাঁগা, আজ এখনও কি স্নান করিবার বেলা হয় নাই? রান্নাবান্না জুড়াইয়া যে একেবারে হিম হইয়া গেল। তোমার সব কাজেই দেখিতে পাই বাড়াবাড়ি! নাও, যথেষ্ট কাজ হইয়াছে, এখন স্নানাহার করিবে চল। যেটুকু বাকী রহিল, সেটুকু কাল করিলেই চলিবে।"

চাষা সেই দারুণ রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে নালা কাটিয়া যাইতেছিল, সহসা এই কথা কানে যাওয়ায় রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল; সে কোদাল ফেলিয়া উঠিয়া স্ত্রীর দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া বলিল,—"মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েমানুষ,—দেখিতে পাইতেছ না, সমস্ত ফসল মরিতে বসিয়াছে? ফসল ম রলে তোমাদেরও যে অনাহারে মরিতে হইবে। আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ক্ষেতে জল না আনিয়া জলস্পর্শ করিব না।"

স্বামীর নিকট ধমক খাইয়া চাষার স্ত্রী মুখখানি চূণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ওদিকে চাষা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া, শেষে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। সন্ধ্যার সময় নদীর জল যখন কল্‌কল্ করিয়া তাহার ক্ষেতে ঢুকিতে লাগিল, তখন একটা অভিনব আনন্দে তাহার বুকের ভিতরটাও কল্‌কল্ করিয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া চাষা তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল,—

"দে রে, এইবার এক ছিলিম তামাক আর তেল দে।"

স্ত্রী তেল ও তামাক আনিয়া দিল। চাষা মনের আনন্দে ভরপুর হইয়া তামাক খাইল; তাহার পরে স্নান করিয়া আসিয়া আহারে বসিল। সেই দিন সেই চাষার আর কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না, সেদিন সে আহার করিয়াছিলও যেমন, ঘুমটাও সেদিন তাহার তেমন গাঢ় হইয়াছিল।

অপর একজন চাষাও নদী হইতে তাহার ক্ষেতে জল আনিবার জন্য নালা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল,—"ওগো, বেলা ঢের হইয়াছে, স্নান আহার করিবে চল।"

স্ত্রী যখন স্বয়ং ডাকিতে আসিয়াছে, তখন কি আর সে আপত্তি করিতে পারে? সে এক মুখ হাসিয়া বলিল,—"তুমি যখন নিজে এত কষ্ট করিয়া আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ, তখন কি আর বিলম্ব করিতে পারি? চল, চল।" চাষা কোদাল কাঁধে করিয়া স্ত্রীর পিছনে পিছনে বাড়ী চলিয়া গেল। কাজেই তাহার নালা কাটিতে বিলম্ব হইয়াছিল, এদিকে জলের অভাবে ক্ষেতের ফসলগুলি মরিয়া গেল।

অধ্যবসায় না থাকিলে মানুষ কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প না হইলে চাষার নদী হইতে নালা কাটিয়া যথাসময়ে ক্ষেতে জল আনা সম্ভবপর হইত না। তেমনই ভগবানের করুণা-লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা না হইলে ও সেজন্য প্রাণপণে সাধনা না করিলে কখনও তাহা লাভ করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

কল্প-বৃক্ষ

এক পাথক অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছিল। হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়া এক গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। পথিক যে গাছটার তলায় আসিয়া বসিয়াছিল, সেটা ছিল একটা কল্প-বৃক্ষ। কল্প-বৃক্ষের মজা হইতেছে এই যে, তাহার তলায় বসিয়া যে যাহা চাহিবে, সে তাহাই পাইবে। পথিক সেই গাছের তলায় কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর মনে মনে ভাবিল, যদি এখন আমি একপেট আহার ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল পাইতাম, তাহা হইলে বড় ভালো হইত। পথিকের এই কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে অমনি তাহার নিকট এক থালা খাবার ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল আসিয়া হাজির হইল।

পথিকের আনন্দ দেখে কে? সে তৃপ্তির সহিত সবটা খাবার খাইয়া ফেলিল ও এক ঘটি জল খাইয়া অনেকটা

সুস্থ হইল। তাহার পর কিছুক্ষণ বাদে আবার তাহার মনে হইল, এখন যদি একটা বাঘ আসিয়া আমাকে মুখে করিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে—পথিকের কথাটা আর শেষ হইল না, অমনি একটা বাঘ আসিয়া তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া গেল।

ভগবানও ঠিক এই কল্পবৃক্ষের মত। যে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন ও ক্ষমতাহীন ভাবে, সে তাঁহার কাছে কিছুই পায় না—আর যে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নিকট যাহা চায় তাহাই পায়।

পুরোহিত ও গোয়ালিনী

এক গোয়ালিনী নদীর ওপার হইতে আসিয়া এক পুরোহিতের বাড়ীতে দুধ জোগাইত, কিন্তু খেয়ানৌকার জন্য তাহার রোজই দুধ আনিতে বেলা হইয়া পড়িত। রোজ রোজ দুধ দিতে বেলা হইবার জন্য ব্রাহ্মণ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গোয়ালিনীকে বলিলেন,—"তোর প্রত্যহ দুধ আনিতে এত বেলা হয় কেন?"

গোয়ালিনী বলিল,—"ঠাকুর, কি করিব বলুন?—আমাকে নদীর ওপার হইতে আসিতে হয়—খেয়া-ঘাটে আসিয়া খেয়া-নৌকার জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়, কাজেই বেলা হইয়া পড়ে।"

গোয়ালিনীর কথায় পুরোহিত বলিলেন,—"ভগবানের

নাম করিয়া মানুষ অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া আসে, আর তুই এই ছোট নদীটা পার হইতে পারিস না ?”

গোয়ালিনী আর কোন কথা বলিল না, কিন্তু পরদিন হইতে সে ঠিক সময়েই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দুধ জোগাইতে আরম্ভ করিল। ইহার কিছুদিন পরে পুরোহিত একদিন আবার গোয়ালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হ্যাঁরে, এখন আর তোর দুধ আনিতে দেরী হয় না কেন ?”

গোয়ালিনী বলিল,—“ঠাকুর, এখন তো আর আমায় খেয়ানৌকার জন্য বসিয়া থাকিতে হয় না—আপনার কথামত এখন আমি ভগবানের নাম করিয়া নদী পার হইয়া আসি।”

পুরোহিত গোয়ালিনীর এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না,—গোয়ালিনী কেমন করিয়া নদী পার হইয়া আসে, তাহা নিজে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণ একদিন, গোয়ালিনী কেমন করিয়া নদী পার হয় দেখিবার জন্য গোয়ালিনীর অনুসরণ করিলেন।

গোয়ালিনী নদীর তীরে আসিয়া একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া নদীর জলের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। পুরোহিতও তাহার পিছনে পিছনে চলিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন, তিনি ক্রমেই ডুবিয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া গোয়ালিনী বলিল,—“ঠাকুর, একি ! আপনি ভগবানের নামও করিলেন, অথচ পাছে জলে কাপড় ভিজিয়া যায়, সেই জন্য কাপড়ও সামলাইতেছেন। দেখিতেছি, ঠাকুর, আপনার ভগবানের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।”

দেখিতেছি, ঠাকুর, আপনার ভগবানের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।

গোয়ালিনীর মতই ভক্ত অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। আর যদি মনে দ্বিধা বা সংকোচ থাকে—তবে পুরোহিতের মত খানিক দূর গিয়াই ডুবিতে হয়। পরকে উপদেশ দেওয়া পুঁথি পড়া হইতেও চলিতে পারে—গভীর বিশ্বাস পুঁথি পড়িয়া পাওয়া যায় না, আবার দুধ বেচিতে বেচিতেও পাওয়া যাইতে পারে।

কাঠুরিয়া ও সন্ন্যাসী

এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটিত। বাজারে সে কাঠ বেচিয়া সামান্য যাহা কিছু পাইত, তাহাতে অতি কষ্টে তাহার দিন কাটিত। একদিন কাঠুরে বনে কাঠ কাটিতেছিল, সেই সময় সেইখান দিয়া এক সন্ন্যাসী যাইতেছিলেন। তিনি কাঠুরেকে কাঠ কাটিতে দেখিয়া বলিলেন,—"ভাই, তুমি এমন বনের ধারে কাঠ কাটিতেছ কেন? বনের ভিতরে প্রবেশ কর, নিশ্চয়ই তুমি অধিক উপার্জ্জন করিবে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কাঠুরে সন্ন্যাসীর কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক, পরদিন সে সন্ন্যাসীর কথা মত বনের ভিতর প্রবেশ করিল। বনের ভিতর কিছুদূর গিয়াই সে দেখিল, বনের একটা দিকে শুধু চন্দনের গাছ। চন্দন-গাছের বন দেখিয়া কাঠুরের আনন্দ আর ধরে না। সেদিন সে যত পারিল চন্দন-কাঠ কাটিয়া লইয়া বাজারে

উপস্থিত হইল। চন্দন-কাঠ,—কাজেই অন্য সব দিন সে কাঠ বেচিয়া যাহা পাইত, তাহার চারি গুণ দাম পাইল। কাঠুরের বেশ সুখেই দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে গিয়া কাঠুরের হঠাৎ মনে হইল, সন্ন্যাসী তাহাকে বলিয়াছিলেন, বনের ভিতর প্রবেশ কর—কই, তিনি তো চন্দন কাঠের কথা কিছুই বলেন নাই; দেখি না, আর একটু অগ্রসর হইয়া যদি অন্য কিছু পাই। কাঠুরের এই কথা যেমন মনে হইল, অমনি সে চন্দন-বন ফেলিয়া আরও একটু গভীর বনের ভিতর অগ্রসর হইল। চন্দন-বন ফেলিয়া কিছুদূর গিয়াই সে একটি তামার খনি দেখিতে পাইল। এই ভাবে সে যতই বনের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিল,—ততই সে তামার খনির পর সোনার খনি, সোনার খনির পর হীরার খনি দেখিতে পাইল এবং খনির দৌলতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে একজন মস্ত ধনী হইয়া পড়িল।

সত্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কেবল কাঠুরের মত বনের ধারে কাঠ কাটিলে চলিবে না, বনের ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—যতই তোমরা জ্ঞানরাজ্যের ভিতর অগ্রসর হইবে, ততই নূতন নূতন জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। সন্ন্যাসী তাই কাঠুরেকে বলিয়াছিলেন, অগ্রসর হও। আমরাও বলি, অগ্রসর হও। যতই অগ্রসর হইবে ততই নূতন জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

ব্যাসদেবের নদী পার

একদিন ব্যাসদেব যমুনা পার হইতে যাইতেছিলেন, সেই সময় গোপীরা আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল, তাহাদেরও যমুনা পার হইতে হইবে; বর্ষাকাল—যমুনা তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। খেয়া-নৌকাও নাই। গোপীরা ভাবিয়া আকুল—কেমন করিয়া নদী পার হইব! নদীর কূলে ব্যাসদেবকে দেখিয়া গোপীরা বলিল,—"ঠাকুর, আমাদের নদী পার হইতে হইবে, খেয়া-নৌকা একখানিও নাই,—আমরা কেমন করিয়া নদী পার হইব?"

গোপীদের কথা শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন,—"সেজন্য তোমাদের ভাবিতে হইবে না; আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। কিন্তু আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত, তোমরা আমাকে কিছু খাইতে দাও।"

গোপীদের নিকট দুধ, ননী, মাখন ছিল, তাহারা ব্যাসদেবকে তখনই খাইতে দিল। ব্যাসদেব পরম তৃপ্তির সহিত সেই সকল আহার করিলেন। আহার শেষ হইলে গোপীরা বলিল,—"ঠাকুর, এইবার আমাদের পারের ব্যবস্থা করুন।"

ব্যাসদেব যমুনার কূলে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"হে যমুনে! আজ যদি আমি কিছু আহার না করিয়া থাকি, তবে আমাদের একটু পথ দাও।"

ব্যাসদেবের কথা শেষ হইতে না হইতে অমনি যমুনা দুই

দিকে সরিয়া গেল ও মাঝখানে পথ বাহির হইয়া পড়িল। এই ব্যাপারে গোপীরা একেবারে অবাক হইয়া গেল। তাহারা মনে মনে ভাবিল, এ কি রকম হইল! এইমাত্র ব্যাসদেব আহার করিলেন,—অথচ তিনি যেমন বলিলেন, আমি যদি কিছু আহার না করিয়া থাকি তবে যমুনা পথ দাও, অমনি যমুনা পথ দিল—ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ যে কি, গোপীরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? ব্যাসদেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—তিনি কেহই নন, তাঁহার ভিতরে যে ভগবান রহিয়াছেন তিনিই সব। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু খাইবে, যাহা কিছু হোম করিবে, তাহা সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। প্রকৃত ভক্ত এই উপদেশ মানিয়া চলেন। ব্যাসদেব ছিলেন প্রকৃত ভক্ত, তিনি যাহা কিছু খাইতেন তাহা শ্রীভগবানকেই অর্পণ করিতেন। কাজেই তিনি নিজে আহার করেন নাই ভগবানই আহার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কথায় যমুনা পথ দিয়াছিল। ভগবানের উপর যে এরূপ বিশ্বাস রাখিতে পারে, তাহার নিজের বলিয়া আর কিছুই থাকে না।

জটিল ও দীনবন্ধু দাদা

একদেশে এক বালক ছিল, তাহার নাম জটিল। জটিল বড় দুঃখী। পৃথিবীতে মা ভিন্ন জটিলের আর কেহ ছিল না। জটিল রোজ একাকী বনের ভিতর দিয়া পাঠশালায় যাইত। বনের ভিতর দিয়া একাকী যাইতে তাহার বড় ভয় হয়। একদিন সে তাহার মাকে বলিল,—"মা, বনের ভিতর দিয়া পাঠশালায় যাইতে আমার বড় ভয় করে।"

জটিলের কথায় জটিলের মার চোখে জল আসিল, তিনি বলিলেন,—"বাবা, ভয় কি? যখনই তোমার ভয় হইবে তখন 'দীনবন্ধু দাদা' বলিয়া ডাকিও, তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয় থাকিবে না।"

জটিল জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ মা, 'দীনবন্ধু দাদা' কে?"

জটিলের মা বলিলেন,—"তোমার বড় দাদা!"

সেইদিন হইতে পাঠশালায় যাইবার সময় যখনই জটিলের ভয় হইত তখনই সে চীৎকার করিয়া ডাকিত, "দীনবন্ধু দাদা, দীনবন্ধু দাদা, আমার বড় ভয় করিতেছে—কই এস, আমাকে দেখা দাও।"

সরল বিশ্বাসী বালকের ডাকে ভগবান কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভগবান বালকের মূর্ত্তি ধরিয়া তখন জটিলকে দেখা দিলেন। তিনি জটিলের সম্মুখে আসিয়া

ভগবান বালকের মূর্ত্তি ধরিয়া তখন দেখা দিলেন

বলিলেন,—"এই যে ভাই, আমি আসিয়াছি। আর তো ভাই তোমার ভয় করিবার কিছু নাই। চল, আমি তোমাকে পাঠশালায় রাখিয়া আসি।"

পাঠশালার নিকটে আসিয়া ভগবান বলিলেন,—"ভাই, যখনই তুমি আমাকে ডাকিবে, তখনই আসিয়া উপস্থিত হইব। তবে আর ভাই, তোমার ভয় কি?"

সরল বিশ্বাসের এমনই শক্তি যে, বহু সাধন, ভজন, দান, ধ্যান ইত্যাদিতেও যাহা হয় না, সরল গভীর বিশ্বাসে তাহা সম্ভব হয়।

ভণ্ড স্বর্ণকার

এক গ্রামে এক সেক্‌রা ছিল, তাহার মত ভক্ত বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেক্‌রা গোঁড়া বৈষ্ণবের মত সর্ব্বাঙ্গে ভগবানের নাম তিলক কাটিয়া দোকানের ভিতর বসিয়া থাকিত এবং দিন রাত্রি কেবল ভগবানের নাম করিত। সেক্‌রার চালচলন দেখিয়া গ্রামের সকলেই সেক্‌রাকে বড় ভাল মানুষ বলিয়া জানিত এবং সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করিত। যখনই যাহার যাহা কিছু গহনা গড়াইবার দরকার হইত, তখনই সে এই সেক্‌রার দোকানেই যাইত। কারণ সকলেই ভাবিত, অমন লোকের দ্বারা জুয়াচুরি বাটপাড়ি হইতে পারে না।

যখনই সেক্‌রার দোকানে খরিদ্দারগণ আসিত, তখনই সেক্‌রা ভিতর হইতে বলিয়া উঠিত,—"কেশব, কেশব।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন কারিকর আসিয়া বলিত,—"গোপাল—গোপাল।"

তাহার সুরে সুর দিয়া অপর একজন কারিকর অমনি বলিত,—"হরি—হরি।"

সেক্‌রা ভিতর হইতে তখনি আবার বলিত,—"হর—হর।"

দোকানে না উঠিতেই এইরূপ ভগবানের নাম শুনিয়া খরিদ্দারগণের মনে একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস হইত, আহা, সেক্‌রার মত ভাল লোক আর দ্বিতীয় নাই।

কিন্তু আসল কথা, সেক্‌রাটি ছিল ভণ্ড ও জুয়াচোর। সেক্‌রা ভিতর হইতে বলিত, "কে-শব"—অর্থাৎ এরা সব কে? কারিকর উত্তর দিত, "গোপাল"—অর্থাৎ এদের মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছি, ইহারা গরুর পাল। তখনি আর একজন বলিত, "হরি হরি"—অর্থাৎ তাহলে চুরি করা যাক। সেক্‌রা অমনি ভিতর হইতে বলিত, "হর হর"—অর্থাৎ হ্যাঁ, চুরি কর।

শুধু তিলক-মালা পরিলেই যে সে সাধু হইবে, তাহার কোন মানে নাই। যাহার প্রাণে ভক্তি আছে, ভগবানে বিশ্বাস আছে, সে-ই যথার্থ সাধু।

———

দুই ভাই

এক গ্রামে দুই ভাই বাস করিত। কিছুকাল যাইলে বড় ভাই সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। নানা তীর্থ ঘুরিয়া বার বৎসর পরে তিনি একবার জন্মভূমি দেখিতে আসিলেন। বার বৎসর পরে বড় ভাই বাড়ী আসিয়াছেন, ছোট ভাইয়ের আর আনন্দ ধরে না! নানা কথার পর ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা দাদা, ঘর-সংসার ছাড়িয়া এই বার বৎসর তুমি সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াইলে, ইহাতে তুমি লাভ করিলে কি?"

বড় ভাই মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি কি লাভ করিয়াছি, আমার সহিত এস, এখনি দেখিতে পাইবে।"

এই কথা বলিয়া বড় ভাই ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া নদীর কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হাঁটিয়া নদী পার হইয়া চলিয়া গেলেন। সেটা খেয়া-ঘাট, খেয়া-নৌকা ক্রমাগতই এপার-ওপার করিতেছিল। ছোট ভাই একটি পয়সা দিয়া খেয়া-নৌকায় বড় ভাইয়ের পিছনে পিছনেই পরপারে যাইয়া উপস্থিত হইল, তারপর বড় ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দাদা, এই বার বৎসর এত কষ্ট করিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া শেষে তুমি এই ক্ষমতা লাভ করিলে—যাহার দাম একটি পয়সা মাত্র!"

বড় ভাই ছোট ভাইয়ের একথার কোন উত্তর দিতে

পারিলেন না। সত্যই ত, তিনি যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাহার মূল্য কেবল মাত্র একটি পয়সা।

সামান্য একটু ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য যাহারা আত্ম-নিগ্রহ করে বা অনেক কিছু বুজরুকি অভ্যাস করে, তাহাদের কেবল কষ্ট ও পরিশ্রমই সার হয়। ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যাহারা লোককে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে, অলৌকিক কিছু দেখাইবার জন্য শক্তি ও সময়ের অপচয় করে, তাহারা ভগবানের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। আর যাঁহারা কেবল ভগবানকে পাইবার আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই সন্ন্যাস সার্থক হয়।

সাধু ও ভগবান

এক দেশে এক পরম ধার্ম্মিক সাধু ছিলেন। কঠিন যোগ-সাধনা করিয়া তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। সাধু, অন্য সব বিষয়েই সাধুর মতই ছিলেন, কিন্তু এই অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়া তাঁহার মনে বেশ একটু অহঙ্কার হইয়াছিল। ভগবান সাধুকে শিক্ষা দিবার জন্য একদিন ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেই সাধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বসিবার জন্য আসন দিলেন এবং তাঁহার নিকট তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন।

সেই সময় সেইখান দিয়া একটা হাতী যাইতেছিল।

ভগবান কহিলেন,—"হে মহাপুরুষ! শুনিলাম, যোগ-সাধনার দ্বারা আপনি অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। আচ্ছা মহাপুরুষ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কি এই হাতীটাকে এখনি মারিয়া ফেলিতে পারেন ?"

সাধু বেশ একটু অহঙ্কারের সহিত বলিলেন,—"নিশ্চয়ই! ইহা এমন কিছু কঠিন নহে।"

কথাটা শেষ করিয়া সেই সাধু এক মুঠা ধুলা লইয়া বিড় বিড়্ করিয়া কয়েকটা মন্ত্র বলিয়া হাতীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা সেইখানে পড়িয়া মরিয়া গেল। ভগবান বলিলেন,—"আপনি যথার্থই সাধু। কি অদ্ভুত ক্ষমতা আপনার—এত বড় একটা হাতীকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিলেন। আচ্ছা, আপনি ইচ্ছা করিলে এই হাতীটাকে নিশ্চয়ই বাঁচাইয়া দিতেও পারেন।"

সাধু অহঙ্কারে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন,—"আলবত!"

আবার এক মুঠা ধুলা লইয়া মন্ত্র পড়িয়া যেমন হাতীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, অমনি হাতীটা আবার ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও যেদিকে যাইতেছিল সেই দিকে চলিয়া গেল। ভগবান বলিলেন,—"আপনি যথার্থই ক্ষমতাবান পুরুষ। কিন্তু আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। এই হাতীটাকে মারিয়া ফেলিয়া এবং আবার এই হাতীটাকে বাঁচাইয়া দিয়া আপনার লাভ হইল কি ? ইহার দ্বারা কি আপনি ভগবান লাভ করিতে পারিবেন ?"

ভগবানের এই কথায় সাধুর চোখ ফুটিল। তিনি বুঝিলেন,

এই সকল ক্ষমতা কিছুই নহে। সেইদিন হইতে তিনি সমস্ত অহঙ্কার ভুলিয়া ভগবান লাভ করিবার জন্য আবার নূতন সাধনা আরম্ভ করিলেন।

সামান্য একটু শক্তি লাভ করিয়া যাহারা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে ভুলিয়া যায়, তাহারাই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ। সামান্য একটুও অহঙ্কার মনে থাকিলে আর ভগবানকে পাওয়া যায় না।

আকবর ও ফকির

আকবর বাদশাহের রাজত্বে এক ফকির দিল্লীর নিকটে এক বনে বাস করিতেন। ফকিরের নিকট জ্ঞান-লাভ করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিত, কিন্তু দীন-হীন ফকিরের এমন সম্বল ছিল না যে তিনি তাঁহার কুটিরে তাহাদের রাখিয়া শিক্ষা-দান করিতে পারেন। এইজন্য ফকিরের মনে মনে বড় আপসোস হইত। অনেক চিন্তার পর ফকির স্থির করিলেন, তিনি বাদ্‌শাহের নিকট কিছু সাহায্য ভিক্ষা করিবেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া একদিন ফকির আকবর-বাদশার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ তখন প্রাসাদের মস্‌জিদে নমাজ পড়িতেছিলেন। ফকির তাঁহার পিছনে গিয়া বসিলেন। তিনি

বলিতেছিলেন,—"খোদাতলা, তুমি আমায় আরও ধন, আরও রাজত্ব প্রদান কর।"

ফকির আকবরের নিকটেই ছিলেন—আকবরের এই প্রার্থনার কথাগুলি সমস্তই তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। ফকির আর একটিও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে আকবর ফকিরকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া ইঙ্গিতে আবার তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

নমাজ শেষ হইবার পর আকবর ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ফকির, তুমি আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলে. কিন্তু আমাকে একটা কথাও না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলে কেন?"

উত্তরে ফকির বলিলেন,—"জনাব, আমি যেজন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, সেজন্য আর আপনাকে বিরক্ত করিতে চাহি না।"

আকবর কিন্তু ফকিরকে ছাড়িলেন না, তাঁহার আসিবার কারণটুকু জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আকবরের অতিরিক্ত আগ্রহে বাধ্য হইয়া শেষে ফকির বলিলেন,—"বাদশা, রোজই দলে দলে লোক আমার নিকটে গিয়া কিছু শিক্ষা-লাভ করিতে চায়, কিন্তু আমার এমন সম্বল নাই, যাহাতে আমার কুটিরে তাহাদের রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারি, তাই আমি আপনার নিকটে কিছু সাহায্য-প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলাম।"

ফকিরের এই কথা শুনিয়া আকবর বলিলেন,—"বেশ ত, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। তুমি আমাকে এ কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলে কেন?"

ফকির বলিলেন,—"জনাব, যখন আমি দেখিলাম, আপনিও একজন ভিখারী—খোদার নিকট ধন, শক্তি, রাজত্ব ভিক্ষা করিতেছেন, তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম, ভিখারীর নিকট আর ভিক্ষা করিয়া লাভ কি? যদি ভিক্ষা করারই আমার দরকার হয়, তাহা হইলে খোদার নিকটেই ভিক্ষা করিব।"

আকবর ফকিরের কথার আর কোন জবাব দিতে পারিলেন না। ফকির নিজের কুটিরে ফিরিয়া গেলেন। আকবর বাদ্‌শার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার এইটুকু শিক্ষা হইল, মানুষ মানুষকে ভিক্ষা দিতে পারে না। মানুষ মাত্রেই কাঙ্গাল। কাঙ্গাল কি কাঙ্গালকে ভিক্ষা দিতে পারে? সকল ঐশ্বর্য্যের মালিক যিনি, যাঁর শক্তি অনন্ত, সেই ভগবান ভিন্ন কি কেহ কিছু দিতে পারে? যদি ভিক্ষাই চাহিতে হয় তবে তাঁহারই নিকট চাওয়া উচিত।

অন্ধ মানুষ

এক দেশে এক তামাক-খোর বুড়ো ছিল। এক দণ্ড বুড়োর তামাক না হইলে চলিত না। একদিন রাত্রি দুপুরের সময় সেই বুড়োর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তামাক খাইবার

বড় ইচ্ছা হইল। বুড়ো তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া কলিকা লইয়া তামাক সাজিল; কিন্তু চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিল আগুন নাই। কাজেই সে প্রতিবাসীর বাড়ী হইতে আগুন আনিতে চলিল। রাত্রি দুপুরে পাড়ার সকলে ঘুমাইতে-ছিল, বুড়ো অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া একজনকে তুলিল। এত রাত্রে কে ডাকে—দেখিবার জন্য সেই লোকটি ব্যস্তসমস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং বুড়োকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এত রাত্রে! ব্যাপার কি?"

বুড়ো বলিল,—"আমি একটু তামাক খাইব, তাই আগুন চাহিতে আসিয়াছি।"

লোকটা বুড়োর কথা শুনিয়া একেবারে অবাক! হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এত রাত্রে আমার বাড়ীতে আগুন চাহিতে আসিয়াছেন, আপনার হাতেই যে লণ্ঠন জ্বলিতেছে!"

বুড়োর তখন মনে হইল, তাই ত! আমার হাতেই ত লণ্ঠন জ্বলিতেছে! বুড়ো আর কোন কথা কহিল না, যেমন গিয়াছিল তেমনি ফিরিয়া আসিল।

মানুষ যাহা চায় তাহা তাহার ভিতরেই আছে। কিন্তু তবুও তাহারা মায়ায় এমনি অন্ধ যে তাহার জন্যই চারিদিকে হাতড়াইয়া মরে।

———

পুরোহিতের ছেলে

এক গ্রামে এক ঠাকুরের মন্দির ছিল। এই মন্দিরের যিনি পুরোহিত ছিলেন, অর্থাৎ যিনি প্রত্যহ ঠাকুরের পূজা করিতেন, তাঁহার একদিন হঠাৎ অন্য গ্রামে যাইবার বিশেষ দরকার পড়িল। সে রাত্রে আর তিনি ফিরিতে পারিবেন না বুঝিয়া ছেলেকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন,—"আজ রাত্রে তুই ঠাকুরের শীতলটা দিয়া আসিস, আজ রাত্রে হয়তো আমি ফিরিতে পারিব না।"

পুরোহিতের ছেলের বয়স অল্প, সবে পৈতা হইয়াছে। পূজারী ত তাহার উপর পূজার ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। পুরোহিতের ছেলেটি সন্ধ্যার পর ঠাকুরের শীতল দিতে মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল। কখনও সে ঠাকুরের পূজা করে নাই; কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহাও সে বিশেষ জানে না। মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের নৈবেদ্য দেখিয়া সে ভাবিল, ঠাকুর প্রতিমার ভিতর হইতে বাহির হইয়া নিশ্চয়ই রোজ এই সকল সামগ্রী আহার করেন। তাই সে বহুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া রহিল, কিন্তু ঠাকুরকে তবু আসিতে না দেখিয়া সে হাত দুইটি জোড় করিয়া সকাতরে বলিল,—"শীঘ্র আসিয়া আহার কর, রাত বড় বেশী হইতেছে, আমি ছেলেমানুষ, আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিব?"

কিন্তু ঠাকুর কোন কথা কহিলেন না। ঠাকুরকে না আসিতে দেখিয়া পুরোহিতের ছেলের কেমন ভয় হইল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ঠাকুর, বাবা আমায় তোমার পূজা করিতে বলিয়া গিয়াছেন, আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না, তাই কি ঠাকুর তুমি আসিতেছ না ? ঠাকুর, শীঘ্র এস, তুমি না আসিলে বাবা কাল আমাকে বড বকিবেন।"

বেচারা আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না, কেবল ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ সে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখিল, ঠাকুর সম্মুখে বসিয়া আহার করিতেছেন। ঠাকুরের আহার শেষ হইলে পুরোহিতের ছেলে যখন মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"নৈবেদ্য সকল কোথায় রাখিয়া আসিলে ?"

পুরোহিতের ছেলে বলিল,—নৈবেদ্য ! সে ত সব, ঠাকুর খাইয়াছেন।"

ঠাকুর খাইয়াছেন ! পুরোহিতের ছেলের কথায় সকলে অবাক হইয়া গেল। তাহার পর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া নৈবেদ্যের শূন্যপাত্র সকল দেখিয়া, তাহাদের আর আশ্চর্য্যের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

সরল বিশ্বাসের এমনি শক্তি যে, তাহার প্রভাবে পাষাণের ঠাকুর সজীব হইয়া ভোগ-নিবেদন গ্রহণ করেন।

বাঘের বাচ্চা

এক মাঠে এক পাল ছাগল চরিতেছিল। এই সময়ে এক বাঘিনী আসিয়া সেই ছাগলের পালের উপর লাফাইয়া পড়িল। ছাগলগুলা ভয়ে অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঘিনী একটা ছাগল ধরিতে যাইতেছে, সেই সময়ে এক শিকারী বাঘিনীটাকে গুলি করিল। গুলি খাইয়া বাঘিনীর আর ছাগল ধরা হইল না—সেইখানে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এখন বাঘিনীর পেটে বাচ্চা ছিল। গুলি খাইয়া প্রাণ হারাইবার পূর্ব্বে বাঘিনী একটা বাচ্চা প্রসব করিয়া ফেলিল। শিকারী বাঘিনীটাকে লইয়া চলিয়া গেল। বাচ্চাটা ছাগলের পালেই রহিয়া গেল—এবং এই ছাগলের পালের ভিতর থাকিয়া দিন দিন বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। বাঘের বাচ্চাটা ছাগলের দুধ খাইয়া মানুষ হইল এবং ছাগলের সঙ্গে থাকিয়া ঘাস খাইতে শিখিল। ছাগলের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে সেই বাঘের বাচ্চার চালচলন কতকটা ছাগলের মত হইল; এমন কি ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকিতেও শিখিল।

এইভাবে কিছুদিন যাইবার পর সেই ছাগলের পালে আবার এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ছাগলের পালের ভিতর একটি বাঘের বাচ্চা দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। ছাগলের সহিত সেই বাঘের বাচ্চাটাও

ঘাস খাইতেছিল। বাঘ দেখিয়া ছাগলও যেমন ভয়ে অস্থির হইয়া পলাইতেছিল, সেই বাঘের বাচ্চাটাও তেমনি পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই প্রকাণ্ড বাঘটা এই ব্যাপার দেখিয়া ছাগলদের আর কিছু বলিল না—সে ছুটিয়া গিয়া একেবারে সেই ঘাসখেকো বাঘের বাচ্চার কান কামড়াইয়া ধরিল। তখন সে ট্যা ভ্যা করিয়া উঠিল এবং কান ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাঘটা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না, টানিতে টানিতে জলের ধারে আনিয়া বলিল,—"জলের ভিতর চাহিয়া দেখ্। দেখ্, আমারও যেমন মুখ, তোরও তেমনি মুখ। আমিও যা, তুইও তাই।"

কিন্তু বাঘের বাচ্চাটা তখনও কাঁপিতেছিল। বড় বাঘটা খানিকটা মাংস আনিয়া তার মুখে পুরিয়া দিল। ঘাসখেকো বাঘটা প্রথমে কিছুতেই মাংস খাইতেছিল না। প্রথমটা দায়ে পড়িয়া একটু মুখে দিল, পরে মাংসের আস্বাদ পাইয়া তৃপ্তির সহিত সমস্তটুকু খাইয়া ফেলিল। তাহার ভয় ঘুচিল—এতক্ষণে সে বুঝিল, হ্যাঁ, সেও বাঘ বটে। তখন বড় বাঘটা তাহার কানটা আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল,—"তুই বাঘের বাচ্চা হইয়া এত কাল ছাগলের সঙ্গে ছিলি—আর ঘাস খাইতেছিলি। ধিক্ তোকে!"

এই বলিয়া সেই বড় বাঘটা সেই ঘাস-খেকো বাঘটার কান ছাড়িয়া দিয়া মন্থর গতিতে চলিয়া গেল। বড় বাঘটার কথায় সেই ঘাসখেকো ছোট বাঘটার জ্ঞান হইয়াছিল—সেও বাঘ; কাজেই লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিল না! সে সেইখানে

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাঘের মত একটা বিকট গর্জ্জন করিয়া বনের ভিতর ঢুকিল, আর সেই ছাগলের পালে গেল না।

"জলের ভিতর চাহিয়া দেখ।"

পৃথিবীতে মানুষ ঠিক এইরূপ অজ্ঞান হইয়া থাকে—গুরুর কৃপায় তাহারা জ্ঞানলাভ করে ও নিজেকে বুঝিতে ও চিনিতে শেখে। গুরুর কৃপা হইলে অতি অল্প সময়ে অজ্ঞানতা দূর হয়। আমি অক্ষম, আমি দুর্ব্বল, আমি হীন—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষ অক্ষম দুর্ব্বল হীনই হইয়া পড়ে। সকলের মধ্যে যখন ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তখন কেহই হীন অক্ষম নয়—গুরু এই কথাটি বুঝাইয়া মানুষের মনের ব্রহ্মকে জাগাইয়া তোলেন।

কার্ত্তিক ও গণেশ

কৈলাসে ভগবতী একদিন কার্ত্তিক ও গণেশকে লইয়া বসিয়াছিলেন। সেদিন মায়ের গলায় গজমুক্তার হার দুলিতেছিল। কার্ত্তিক-গণেশ—দুইজনেরই মায়ের গলার হারটি নিজের গলায় পরিবার বড় সাধ হইল! দুইজনেই ভগবতীকে বলিলেন,—"মা, তোমার হারটা আমাকে দাও—আমি গলায় পরিব।"

কার্ত্তিক-গণেশের এই আব্দারে ভগবতী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। দুই ছেলেই হার চায়, অথচ তাঁহার গলায় একটি-মাত্র হার। তিনি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তোমাদের

মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ড আগে ঘুরিয়া আসিতে পারিবে, আমি তাহাকে এই হার পরাইয়া দিব।”

ভগবতীর কথা শুনিয়া কার্ত্তিক মনে মনে ভাবিলেন—এই কথা! আমি এখনি ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছি। কার্ত্তিক আর ভগবতীকে কোন কথা না বলিয়া তখনি ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু গণেশ তাহা করিলেন না—তাঁহার জ্ঞান ছিল, তিনি জানিতেন—মায়ের ভিতরেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। তাই তিনি ভগবতীর চারিপাশে ঘুরিয়া প্রণাম করিলেন। ভগবতী সমস্ত বুঝিতে পারিলেন ও বুদ্ধিমান পুত্রের গলায় নিজের গলা হইতে হার খুলিয়া লইয়া পরাইয়া দিলেন।

এদিকে কার্ত্তিক ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—মায়ের গলার হার গণেশের গলায় ঝুলিতেছে। কার্ত্তিক ব্যাপার কি প্রথমে ভাল বুঝিতে পারিলেন না। দাদা এত শীঘ্র কেমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আসিলেন? কিন্তু জননীর মুখে যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন আর লজ্জায় কথা কহিতে পারিলেন না। জননীর ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড আছে—গণেশের মত এ বিশ্বাস যে সন্তানের আছে, সেই যথার্থ সন্তান!

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ-শিক্ষা

গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট কৌরব ও পাণ্ডবগণের যখন ধনুর্বিদ্যা-শিক্ষা শেষ হইল, তখন দ্রোণাচার্য্য তাহারা কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহারই পরীক্ষা করিবার জন্য একটি বৃক্ষের উপর একটি পক্ষী রাখিয়া, শিষ্যগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিষ্যরা আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বৃক্ষের উপরিস্থিত পাখীটিকে তাহাদের দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ পাখীর চক্ষু বিঁধিয়া ফেলিতে হইবে।" তাহার পর একে একে শিষ্যদের ডাকিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। যে কেহ ধনুর্ব্বাণ লইয়া চক্ষু বিঁধিতে আসে, অমনি তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কি দেখিতেছ?"

সকলের মুখেই এক উত্তর,—"গাছের উপর পাখী দেখিতেছি; তাহার উপর আকাশ দেখিতেছি, চারিদিকে ডাল-পালা-গাছ দেখিতেছি।"

অমনি দ্রোণাচার্য্য বলেন,—"যাও—তুমি চক্ষু-ভেদ করিতে পারিবে না।"

এই ভাবে একে একে সকলের পরীক্ষা শেষ হইবার পর অর্জ্জুনের পালা আসিল। অর্জ্জুন গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া পাখীর চক্ষুভেদ করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছ?"

অর্জ্জুন উত্তর দিলেন,—"পাখীর চক্ষু।"

দ্রোণাচার্য্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে দেখিতে পাইতেছ ?"

অর্জ্জুন বলিলেন,—"না।"

দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গাছটি দেখিতে পাইতেছ ?"

অর্জ্জুন ঘাড় নাড়িলেন। দ্রোণাচার্য্য আবার বলিলেন,—"গাছের উপর পাখীকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেছ !"

অর্জ্জুন ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্বের মত বলিলেন,—"না।"

দ্রোণাচার্য্য তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি কি দেখিতেছ ?"

অর্জ্জুন গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন,—"মাত্র পাখীর একটা চক্ষু।"

দ্রোণাচার্য্য শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তুমিই যথার্থ লক্ষ্যভেদ শিখিয়াছ। তোমারই শিক্ষা সার্থক।"

গুরুর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন পাখীর চক্ষু ভেদ করিলেন। শিক্ষায় যাহার অর্জ্জুনের মত একাগ্রতা থাকে—সেই যথার্থ শিক্ষার অধিকারী হয়। যে বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহাতেই সমস্ত মনটুকু নিয়োজিত হওয়া চাই, নতুবা যথার্থ শিক্ষালাভ করা যায় না।

এইরূপ একাগ্রতা না হইলে ভগবানকেও পাওয়া যায় না। সাধক যখন ভগবানে চিত্ত অর্পণ করেন, তখন অর্জ্জুনের মতই বিশ্ব-জগতের আর কিছু তাঁহার চোখে পড়ে না।

কবিরাজ ও রোগী

এক দেশে এক কবিরাজ ছিলেন—তাঁহার পসার যথেষ্ট। দিনরাত রোগীর ভিড়ে তাঁহার গৃহ পূর্ণ থাকিত। একদিন তাঁহার নিকট একটি রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি তাহার রোগ-পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও বলিলেন,—"কাল একবার আসিও, সেই সময় তোমার পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বলিব।"

রোগী ঔষধ লইয়া চলিয়া গেল এবং পরদিন আবার কবিরাজের কথামত কবিরাজের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কবিরাজ তাহাকে বলিলেন,—"দেখ বাপু, গুড়টা খাইও না, গুড় খাওয়া একেবারেই ভাল নয়।"

রোগী চলিয়া গেল। সেইখানে অপর একটি লোক বসিয়াছিলেন। রোগী চলিয়া গেলে তিনি কবিরাজকে বলিলেন,—"আচ্ছা, এই লোকটিকে আজ আবার আসিতে বলিয়াছিলেন কেন? কালই ত ঐ কথাটা অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিতেন।"

সেই লোকটার কথায় কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"শুধু শুধু মানুষ মানুষকে কোন কথা বলে না। কাল এই ঘরে আমার কয়েকটি গুড়ের নাগ্‌রি ছিল। কাল যদি আমি উহাকে বলিতাম, গুড় খাওয়া ভাল নয়—সে কথা ও কিছুতেই

বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহার নিশ্চয় মনে হইত,

কাল তোমার পথ্যাপথ্যের কথা বলিব

কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে যখন এত গুড়ের নাগ্‌রি, তখন গুড় খাওয়াটা খারাপ হইতেই পারে না।”

কবিরাজের কথার অর্থ সেই লোকটি এতক্ষণে বুঝিলেন। নিজে ভাল না হইয়া পরকে ভাল হইবার উপদেশ দিলে কোন ফলই হয় না।

সাধু ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিয়া বহু ভোগ্য দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। তাহা না করিলে, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে ভাবে, সাধু নিজে ভোগ করিয়া অপরকে যে উপদেশ দেন—তাহা তাঁহার ভণ্ডামি।

বারুণী-স্নান

শিব ও দুর্গা কৈলাসে দাবা খেলিতে বসিয়াছিলেন। সেদিন বারুণী-যোগ। হঠাৎ খেলার চাল বন্ধ করিয়া মা-দুর্গা শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“প্রভু, আজ বারুণী-যোগ। এই যোগে মানুষ গঙ্গা-স্নান করিলে নিষ্পাপ হয়। আজ ত লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গা-স্নান করিবে, তাহারা কি সকলেই নিষ্পাপ হইবে?”

মা-দুর্গার কথায় মহাদেব একটু হাসিয়া বলিলেন,—“নিশ্চয়। যাহার বিশ্বাস আছে যে বারুণী-যোগে স্নান করিলে নিষ্পাপ হইবে—সে হইবেই।”

মা-দুর্গা আবার বলিলেন,—"সে বিশ্বাস না থাকিলে, মানুষ কেন গঙ্গা-স্নান করিতে ছুটিবে? যাহারা আজ স্নান করিবে, নিশ্চয় তাহাদের বিশ্বাস আছে।"

মহাদেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না, সেরূপ বিশ্বাস খুব কম লোকেরই থাকে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।"

পরীক্ষা না করিয়া মা-দুর্গা সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তখন মহাদেব দুর্গাকে লইয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিবেণীতে আসিয়া গঙ্গার জলে তিনি এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের মূর্ত্তি ধরিয়া ভগবতীর জানুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন; ভগবতীও বুড়ার মূর্ত্তি ধরিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই পথে লক্ষ লক্ষ লোক বারুণী-যোগে গঙ্গা-স্নান করিতে ছুটিয়াছে। ভগবতী একে একে সকলকেই ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওগো, আমার স্বামীর মৃত্যুকাল উপস্থিত, তোমরা যদি একটু ধর, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বারুণী-যোগে একবার গঙ্গা-স্নানটা করাইয়া দিতে পারি।"

বুড়ীর কথায় সকলেই তাঁহার স্বামীকে একটু ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলে বৃদ্ধারূপিণী ভগবতী কহিলেন,—"কিন্তু আমার স্বামীর আদেশ, যে ব্যক্তি নিষ্পাপ নহে, সে যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে। তোমাদের মধ্যে নিষ্পাপ যে, সেই আসিয়া আমার স্বামীকে একটু ধর।"

ভগবতীর কথায় সকলেই পিছাইয়া গেল; সকলেই বলিতে লাগিল,—"পৃথিবীতে 'আমি নিষ্পাপ' কি করিয়া বলি,

বুড়ী? আমাদের সকলের মধ্যে কিছু না কিছু পাপ আছে।"

লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গা-স্নান করিতে গেল, কিন্তু কেহই বুড়ীর কথায় সম্মত হইল না—কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিল না যে সে নিষ্পাপ। শেষে এক চাষার ছেলে গামছা মাথায় বাঁধিয়া স্নান করিতে যাইতেছিল, দুর্গা তাহাকেও সেই কথা বলিলেন। দুর্গার কথা শুনিয়া সেই চাষার ছেলে বলিল,—"ইহার জন্য আর ভাবনা কি, মা! আজ বারুণী-যোগ, তুমি মা একটু অপেক্ষা কর, আমি গঙ্গায় ডুব দিয়া এখুনি নিষ্পাপ হইয়া আসিতেছি।"

চাষার ছেলে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গঙ্গায় ডুব দিতে ছুটিল। মহাদেব দুর্গাকে বলিলেন,—"দেখিলে ত, হাজার হাজার লোক গঙ্গায় স্নান করিতেছে—তাহাদের মধ্যে কেবল এই একটা লোক নিষ্পাপ হইবে; ইহারই কেবল বিশ্বাস আছে, আজ বারুণী-যোগে গঙ্গা-স্নান করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায়।"

মহাদেবের কথায় দুর্গা এইবার বুঝিলেন—যোগে-যাগে স্নানে-দানে কেন মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে না।

সব বিষয়েই গভীর বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস ব্যতীত মনুষ্যের কোন পুণ্যকর্ম্ম সফল হইতে পারে না।

———

ব্রহ্মবিদ্যা

একটি ব্রাহ্মণের দুইটি ছেলে ছিল। ছেলে দুইটি বড় হইলে ব্রাহ্মণ তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইবার জন্য এক আচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র দুইটি আচার্য্যের নিকট থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর আচার্য্যের নিকট থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে তাহারা আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ বড় ছেলেটিকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত দিন তো তোমরা আচার্য্যের গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিখিয়া আসিলে—আচ্ছা, বল দেখি, ব্রহ্ম কি?"

পিতা প্রশ্ন করিবামাত্র বড় ছেলে তখনই বড় বড় শাস্ত্র হইতে লম্বা লম্বা শ্লোক তুলিয়া, ব্রহ্ম কি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল এবং বলিতে লাগিল,—"ব্রহ্ম এত বড়, ব্রহ্ম তত বড়!"

ব্রাহ্মণ কোন কথা বলিলেন না। তিনি তাঁহার ছোট ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বাপু, তুমি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি শিখিয়াছ বল দেখি শুনি?"

ছোট ছেলে পিতার প্রশ্নে একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল,—তাহার পর ব্রহ্ম কি তাহাই পিতাকে বুঝাইবার জন্য দুই তিনবার হাঁ করিল; কিন্তু কোন কথাই মুখ ফুটিয়া

বলিতে পারিল না। ছোট ছেলের এই ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি তোমার ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি ব্রহ্ম কি কতক বুঝিতে পারিয়াছ। সত্যই, ব্রহ্ম যে কি, তাহা মুখে বলা যায় না।"

'ভগবানকে বুঝিয়াছি' যাহারা বলে, তাহারা তাঁহাকে একেবারেই বুঝিতে পারে নাই। কারণ ভগবান এমন জিনিস যে তাঁহাকে একেবারে বুঝিলে আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হয় না।

"জানি বলে যেবা করে অভিমান কিছুই জানে না তারা
জেনেছে যে জন সে জন হে প্রভু হয়েছে বাক্যহারা।"

কাকের ভক্তি

রাম ও লক্ষ্মণ চম্পক-সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ দেখিলেন, একটি কাক অতি ব্যাকুলভাবে বার বার জল খাইতে যাইতেছে, কিন্তু জল খাইতেছে না—বার বার ফিরিয়া আসিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মণের বড় কৌতূহল হইল, তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা, এই কাকটা জল খাইতে যাইয়া বার বার ফিরিয়া আসিতেছে কেন?"

লক্ষ্মণের এই প্রশ্নে রাম বলিলেন,—"ভাই, এই কাক বড়ই ভক্ত, দিন-রাত রাম-নাম জপ করিতেছে। জল-তৃষ্ণায় উহার ছাতি ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে, তাই জলপান করিতে নদী-তীরে ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু জলপান করিবার সময় রাম-নাম ফাঁক পড়িয়া যাইবে, সেই আশঙ্কায় জল পান না করিয়াই ফিরিয়া যাইতেছে।"

ভক্ত হওয়া সহজ নয়। যে ভগবানকে এই ভাবে দিন-রাত্রি ডাকিতে পারে, সেই কেবল ভগবানকে লাভ করিতে পারে। জীবন-সংশয় হইলেও যে ভগবানের কথা ভুলিতে পারে না, সেই প্রকৃত ভক্ত।

রামের ধনুক

বনে ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশ্রান্ত হইয়া স্নান করিবার জন্য রাম ও লক্ষ্মণ একদিন পম্পা-সরোবর-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরোবরে নামিবার পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ধনুকটি সরোবর-তীরে মাটিতে গুঁজিয়া রাখিলেন। স্নান শেষ করিয়া দুই ভাইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন ও শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ধনুকটি মাটি হইতে আবার তুলিয়া লইলেন। শ্রীরামচন্দ্র ধনুক তুলিবামাত্র লক্ষ্মণ দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের ধারটুকু রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মণ একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকে রক্ত কোথা হইতে আসিল?

শ্রীরামচন্দ্র ধনুক দেখিয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, একি ব্যাপার ? দেখ, দেখ, নিশ্চয়ই কোন জীব-হত্যা হইয়াছে।"

লক্ষ্মণও রক্ত দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তখনই মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। মাটি খুঁড়িয়া তিনি দেখিলেন, একটা ভেক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ভেকের অবস্থা দেখিয়া করুণাময় শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ; তিনি অতি করুণস্বরে বলিলেন,—"বাছা, তুমি শব্দ কর নাই কেন—তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বাঁচাইবার চেষ্টা করিতাম ; এমন ভাবে তোমার প্রাণ-বিয়োগ হইত না! যখন সাপে তোমাকে ধরে, তখন ত তোমরা চীৎকার কর, এখন চুপ করিয়া রহিলে কেন ?"

শ্রীরামচন্দ্রের কথার উত্তরে ভেক উত্তর করিল,—"শ্রীরাম-চন্দ্র, যখন সাপে আমাকে ধরে তখন আমি 'রাম, রক্ষা কর' 'রাম, রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করি। কিন্তু যখন দেখিলাম, স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রই আমাকে বধ করিতেছেন, তখন আর কাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ডাকিব ? তাই চুপ করিয়া ছিলাম।"

ভেকের এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

বিপদে পড়িলে, মানুষের স্বভাব অস্থিরতা প্রকাশ করা। কিন্তু ভগবান যখন মারেন, তখন অস্থির হইয়া কোন লাভ নাই। ০

মাছ ধরা

একটি লোক একজনের পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। বহুক্ষণ ছিপ ফেলিয়া বসিয়া থাকিবার পর ফাতনাটা একটু একটু নড়িতে লাগিল। সে ভাবিল, এইবারে চারে মাছ আসিয়াছে। তারপর মাঝে মাঝে ফাতনাটা কাত হইতে লাগিল, তখন সে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া টান দিবার জন্য ছিপ গাছটি বাগাইয়া ধরিল। ঠিক সেই সময়ে সেই পুকুরের ধার দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল; সে সেই ছিপ হাতে লোকটির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অমুক বাঁড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন, মশায়?"

তখন যে লোকটি মাছ ধরিতেছিল, সে টান মারিবার যোগাড় করিতেছে, লোকটার প্রশ্নের কোনও উত্তরই দিল না। লোকটা তবুও বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"অমুক বাঁড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন?"

ছিপ হাতে লোকটির অন্য দিকে কান দিবার অবসর নাই। তখন তাহার হাত কাঁপিতেছে—দৃষ্টি কেবল ফাতনার দিকে। লোকটা বার বার এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে নিরস্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। সেই সময় বড়শিতে টান ধরিল—ফাতনা ডুবিল—টানে একটা মাছ একেবারে পুকুরের পাড়ে আসিয়া পড়িল। তারপর সেই ব্যক্তি গামছা দিয়া মুখ 'মুছিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি পড়িল সেই লোকটার উপর। তখন সেই লোকটি অনেক দূর চলিয়া

গিয়াছে। সে বড়শি হইতে মাছটি খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—"মহাশয়, শুনুন, শুনুন।"

বাঁড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন?

যিনি যথার্থ সাধু, তাঁহার শত্রু-মিত্র ভেদ থাকে না, মানুষকে তিনি যন্ত্রমাত্র মনে করেন। তিনি জানেন, ভগবানই এই যন্ত্র চালান; সুতরাং তিনি সকল আত্মার ভিতরেই ভগবানকে দেখিয়া থাকেন।

জেলের মাছ চুরি

এক দেশে এক জেলে ছিল, সে রাত্রে পরের পুকুরে মাছ চুরি করিয়া বেড়াইত। একদিন ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে সে মাছ চুরি করিবার জন্য একজনের বাগানে প্রবেশ করিল। বাগানের মাঝখানে পুকুর, জেলে নিঃশব্দে পুকুরের নিকটে গিয়া ঝপাৎ করিয়া পুকুরে জাল ফেলিয়া দিল। পুকুরের মালিক যিনি, সজাগ হইয়া পুকুরে পাহারা দিতেছিলেন,—জালের শব্দ শুনিবামাত্র তিনি আলো দিয়া চোর ধরিতে তখনি দুইজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। আলো লইয়া দুই-জন লোক পুকুরের দিকে আসিতেছে দেখিয়া জেলে তাড়া-তাড়ি জালখানা পুকুরের ভিতর ফেলিয়া দিয়া, সাধুর মতন মুখে খানিকটা ছাই মাখিয়া একটা গাছের তলায় বসিয়া পড়িল।

যাহারা চোর ধরিতে আসিয়াছিল, তাহারা কোথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কেবল একজন সাধুকে গাছের

তলায় বসিয়া থাকিতে দেখিল। পুকুরের মালিককে আসিয়া তাহারা তাহাই বলিল। পুকুরের মালিক তাঁহার বাগানে সাধু আসিয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সাধুকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার সেবার জন্য প্রচুর সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন। জেলে পালাই পালাই করিয়াও পালাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। এদিকে ভোর হইয়া গেল।

সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে গ্রামের লোক সাধু দেখিতে আসিতে লাগিল। যে যাহা পারিল, সে তাহা দিয়া সাধুর সেবা করিতে লাগিল। জেলে মনে মনে ভাবিল,—"আমি সাধু নই, কেবল সাধুর মত হইয়া বসিয়াছি বলিয়া আজ লোকে আমায় কত সম্মান করিতেছে। যদি আমি যথার্থ সাধু হই, তাহা হইলে লোকে আমায় না জানি কত ভক্তি করিবে, এমন কি সাধন-ভজন করিতে করিতে হয়তো আমি ভগবানকেও পাইতে পারি।"

এই কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে জেলের মনের ময়লা দূর হইয়া গেল। সে সেইদিন বুঝিতে পারিল, পৃথিবী মিথ্যা—একমাত্র ভগবানই সত্য। তাঁহাকে পাইবার জন্য সে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। মিথ্যা সাধু সাজিবারও এমন মজা যে, তাহাতেও মনের ময়লা দূর হইয়া যায়।

চাষার ছেলে

একটি চাষার একটি বড় সুন্দর ছেলে হইয়াছিল। চাষা তাহার সেই ছেলেটিকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসিত। হঠাৎ একদিন সেই ছেলেটি ভেদ-বমি করিয়া মরিয়া গেল। ছেলেটি মরিয়া যাওয়ায় বাড়ী শুদ্ধ সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চাষা সেজন্য একেবারেই কাতর হইল না, বরং সে বাড়ীর অপর লোকদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। চাষার এই ভাব দেখিয়া চাষার স্ত্রীর মনে মনে স্বামীর উপর বড় রাগ হইল। সে দুঃখ করিয়া চাষাকে বলিল,—"এমন একটা ছেলে মরিয়া গেল, তুমি কি পাষাণ! তাহার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিলে না। বাড়ী শুদ্ধ সকলে কাঁদিতেছে, আর তুমি তো বেশ শান্ত রহিয়াছ!"

চাষা শান্ত স্বরে বলিল,—"দেখ, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমি রাজা হইয়াছি, আমার আটটি ছেলে পরম সুন্দর; তাহাদের লইয়া আমি বড়ই সুখে রাজত্ব করিতেছি। তাই বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই আট ছেলের জন্য কাঁদিব না আমাদের হরিচরণের জন্য কাঁদিব ?"

এই চাষা যথার্থই জ্ঞানী পুরুষ। সে বুঝিয়াছিল যে আমরা জাগরণ অবস্থায় যাহা করি বা যাহা দেখি তাহাও ঠিক স্বপ্নের মত মিথ্যা। এই জীবনটাও দীর্ঘকালস্থায়ী স্বপ্ন

ছাড়া কিছুই নয়। মরণই এই স্বপ্নের গভীর নিদ্রা। ভগবা ব্যতীত পৃথিবীতে সত্য জিনিস কিছুই নাই। কাজেই জ্ঞা পুরুষেরা শোক-দুঃখে একেবারেই বিচলিত হন না।

ধোপার ছেলে

এক দেশে এক ধোপার একটি ছেলে ছিল। ছেলেবে হইতে তাহার বাপ কাপড় কাচা শিখাইতে তাহাকে ঘা লইয়া যাইত। তাহাকে সারাদিন রোদে পুড়িয়া কাপ কাচিতে হইত। ধোপার ছেলে খাটুনি বেশী পড়ি ভগবানকে ডাকিয়া বলিত,—"ভগবান, আর কাপড় কাচিতে পারি না। পরজন্মে আর যেন আমার ধোপার ঘরে জন্ম ন হয়।"

ধোপার ছেলের আকুল নিবেদন ভগবানের কানে গিয় পৌঁছিল। ধোপার ছেলে মরিয়া রাজার ঘরে গিয়া জন্ম লইল। রাজার ঘরে ধোপার ছেলের জন্ম হইল বটে, কিন্তু স্বভাব তাহার রাজার ছেলের মতন হইল না। রাজার ছেলেরা যেরূপ খেলা-ধূলা ভালবাসে, ধোপার ছেলের সে সব খেলা একেবারেই ভাল লাগিত না। একদিন সে খেলা করিতে গিয়া তাহার সমবয়সীদিগকে বলিল,—"ভাই, তোরা যে সকল খেলা করিস, সে খেলা খেলিতে আমার একেবারেই ভাল

লাগে না। তার চেয়ে আমি যে খেলা বলি, আয় ভাই, সেই খেলা করি, আয়। আমি উপুড় হইয়া শুই, আর তোরা সকলে মিলিয়া আমার পিঠের উপর হুস্‌হুস্‌ করিয়া কাপড় কাচিতে আরম্ভ কর।”

রাজার ছেলের এই কথায় তাহার সমবয়সীরা একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহারা সকলে মিলিয়া বলিয়া উঠিল,—“না না, ও আবার কি খেলা, ভাই!”

তাহারা ত বুঝিল না, রাজার ছেলে কেন এমন কথা বলিতেছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংস্কার যায় না। মানুষ নিজের কর্ম্মফল ভোগের জন্য আবার জন্মগ্রহণ করে। পরজন্মেও তাহার সংস্কার থাকিয়া যায়। যে সংস্কারগুলি মন্দ, সাধনার দ্বারা সেগুলিকে দূর করিতে হয়।

রণজিৎ রায়

ভগবান পুত্র-কন্যারূপে যে ভক্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। একদেশে রণজিৎ রায় নামে এক জমিদার ছিলেন। তিনি কালীর বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার তপস্যার জোরে মহামায়াকে কন্যা-রূপে পাইয়াছিলেন। রণজিৎ রায় কন্যাটির নাম রাখিয়াছিলেন ভগবতী। তিনি কন্যাটিকে বড়ই স্নেহ করিতেন ও সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখিতেন। রণজিৎ রায়ের স্নেহের গুণে ভগবতী

তাঁহার গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছুতেই আর রণজিৎ রায়ের স্নেহের বাঁধন ছিঁড়িতে পারিতেছিলেন না।

একদিন সকালে রণজিৎ রায় তাঁহার জমিদারীর হিসাব-পত্র দেখিতেছিলেন, আর মেয়েটি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, 'বাবা, এটা কি, বাবা, ওটা কি?' প্রশ্ন করিয়া মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। রণজিৎ রায় কন্যার জন্য কাজে মন দিতে পারিতেছিলেন না, তিনি কন্যাকে বার বার বলিতেছিলেন,—"মা, এখন আমায় বিরক্ত করিস নে, আমার এই কাজগুলো শেষ করিতে দে।" কিন্তু কন্যা সে কথা একেবারেই কানে তুলিতেছিল না। শেষে রণজিৎ রায় মহাবিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তুই এখান হইতে দূর হইয়া যা।"

ভগবতী সেই ছুতাটি খুঁজিতেছিলেন। রণজিৎ রায় যেমন বলিলেন, 'তুই এখান হইতে দূর হ' অমনি তিনি রণজিৎ রায়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে বাহির হইয়াই তাঁহার সহিত একজন শাঁখারীর দেখা হইল; তিনি তাহার নিকট হইতে শাঁখা পরিলেন। শাঁখা পরিয়া শাঁখারীকে তিনি বলিলেন,—"আমার ঘরে কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, তুমি আমাদের বাড়ী গিয়া সেই টাকা হইতে দাম লইও।"

শাঁখারী ভগবতীকে চিনিত—সে তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া, শাঁখার মূল্য লইবার জন্য রণজিৎ রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শাঁখার দাম চাহিল। তখন মেয়ের কথা সকলের মনে পড়িল। মেয়ের জন্য চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল! চারিদিকে লোক ছুটিল। রণজিৎ রায়—

"মা, তুই কোথায় গেলি?" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শাঁখারীর মুখে সমস্ত শুনিয়া সকলে আসিয়া দেখিল,—সত্যই কুলুঙ্গিতে টাকা রহিয়াছে। তখনই সেই টাকা হইতে শাঁখারীর শাঁখার দাম চুকাইয়া দেওয়া হইল। রণজিৎ রায়ের বাড়ী যখন হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় কয়েকজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—"দীঘিতে কি যেন ভাসিতেছে।"

রণজিৎ রায় কাঁদিতে কাঁদিতে তখনই দীঘির ধারে উপস্থিত হইলেন। সকলে দীঘির ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিল—শাঁখা-পরা হাতখানি তিনবার জল হইতে উপর দিকে উঠিল; তাহার পর আর কিছুই দেখা গেল না। রণজিৎ রায় লোক নামাইয়া সমস্ত দীঘি তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু মেয়ের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

রণজিতের বাড়ী হইতে ভগবতী যেদিন জন্মের মত চলিয়া যান, সেদিন বারুণী-স্নানের দিন। তাই বারুণীর দিনে প্রতি বৎসর এই দীঘির ধারে প্রকাণ্ড মেলা বসে ও ভগবতীর পূজা হইয়া থাকে।

ভগবান কখন যে কি মূর্ত্তিতে মানুষের নিকট আসেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই কাহাকেও দূর-ছাই করিতে নাই।

হীরার দর

এক বড় লোকের একখানা দামী হীরা ছিল। তিনি তাঁহার সেই হীরাখানা বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহার সরকারকে প্রদান করিলেন। সরকারবাবু হীরাখানা লইয়া প্রথম এক বেগুন-ওয়ালার নিকট উপস্থিত হইল। বেগুনওয়ালা হীরাখানা বারকয়েক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—"ভাই, আমি এই পাথরখানার পরিবর্ত্তে তোমাকে নয় সের বেগুন দিতে পারি।"

সরকার বলিল,—"ভাই, দরটা অত্যন্ত কম হইয়া যাইতেছে, তুমি আর একটু উঠিলে আমি এই পাথরখানি তোমায় দিয়া যাইতে পারি। যাক, দশ সের বেগুন দাও।"

বেগুনওয়ালা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"আমি বাজার-দরের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে তোমার যদি পোষায়, তবে আমায় দাও—নতুবা অন্য কোন জায়গায় চেষ্টা দেখ।"

সরকার তখন সেখান হইতে এক কাপড়ওয়ালার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। কাপড়ওয়ালা হীরাখানাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—"হাঁ, জিনিসটা মন্দ নয়, আমি এর দাম নয়'শত টাকা দিতে পারি।"

সরকার বলিল,—"ভাই, আর একটু দর বাড়াও, পুরাপুরি হাজার টাকা দাও—আমি হীরাখানা তোমায় দিয়া যাই।"

কাপড়ওয়ালা বলিল,—"নয় শত টাকার বেশী আর একটি টাকাও তোমায় দিতে পারি না। আমি বরং বেশী দাম বলিয়া ফেলিয়াছি।"

সরকার তখন সেখান হইতে এক জহুরীর নিকট উপস্থিত হইল। জহুরীও হীরাখানা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল—তাহার পর একেবারেই বলিল,—"এ হীরাখানা আমাকে দিয়া যাও, আমি ইহার দাম পাঁচ হাজার টাকা দিব।"

সরকার বলিল,—"না ভাই, আর কিছু বাড়াও।"

জহুরী বলিল,—"বল, আর কত দিতে হইবে—এ হীরাখানা আমার চাই-ই।"

সরকার তখন উপযুক্ত দর পাইয়া হীরাখানা জহুরীর নিকট বিক্রয় করিল।

যাহার যেরূপ পুঁজি সে সেইরূপ মূল্যই দিয়া থাকে। যাহার যতটুকু ধারণা, ভগবানের মূল্য তাহার কাছে ততটাই। যত ভক্তিই থাকুক, অজ্ঞের কাছে ভগবানের মূল্য খুব বেশী নয়। সে মনে করে, সামান্য সাধনাতেই তাঁহাকে বুঝি পাওয়া যায়। জ্ঞানী লোকেরাই ভগবানের মর্য্যাদা বুঝেন। তাঁহারা জানেন, ভগবান অনেক সাধনার ধন, অনেক তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানের মর্য্যাদা বুঝিতে হইলে তাই প্রথমে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞানলাভের জন্য সদ্‌গুরু প্রয়োজন—অনেক সাধনার প্রয়োজন।

গুরু-শিষ্য

একজন সাংসারিক লোক এক গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইতে গেল। গুরু তাহাকে বলিলেন,—"আমি তোমাকে মন্ত্র দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে সংসার ছাড়িতে হইবে।"

শিষ্য গুরুর এই কথা শুনিয়া বলিল,—"প্রভু, সংসার কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাই বলুন? আমার মা বাপ স্ত্রী সকলেই আমাকে ভালবাসে—তাহাদের ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া যাইব?"

শিষ্যের কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন,—"তাহাদিগকে 'আমার' 'আমার' বলিতেছ বটে, আর বলিতেছ, তাহারা তোমাকে ভালবাসে, কিন্তু এ সব মিথ্যা। যদি তুমি পরীক্ষা করিতে চাও—তাহারও উপায় আমি তোমাকে বলিয়া দিতে পারি।"

শিষ্যের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল এবং সে-কথা গুরুকে জানাইল। তখন গুরু তাহাকে বলিলেন,—"আমি তোমাকে একটি ঔষধের বড়ি দিতেছি—এইটি খাইলে তোমার দেহ মড়ার মত অসাড় হইয়া পড়িবে; কিন্তু তোমার জ্ঞান লোপ পাইবে না—লোকে তোমাকে মৃত বলিবে বটে, কিন্তু তুমি সকলই দেখিতে ও শুনিতে পাইবে। তারপর আমি গিয়া আবার তোমার পূর্ব্ব অবস্থা করিয়া দিব।"

গুরুর প্রতি শিষ্যটির প্রগাঢ় ভক্তি—সে গুরুর কথা-মত বাড়ী গিয়া সেই ঔষধের বড়িটি খাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ অসাড় হইয়া মৃতের মত হইয়া পড়িল। কিন্তু গুরু তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল, তাহার জ্ঞান টনটনে রহিল। তাহার এই ভাব দেখিয়া বাড়ীতে একেবারে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। মাতা ও স্ত্রী একেবারে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির। কিছুক্ষণ পরে তাহার গুরু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"কি হইয়াছে ?"

সকলে উত্তর দিল,—"এই লোকটি মারা গিয়াছে।"

গুরু তাঁহার শিষ্যের দিকে একবার চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"কই না, এ লোকটি ত মারা যায় নাই! আমি একটি ঔষধ দিতেছি, সেই ঔষধটি খাওয়াইলেই ইহার সমস্ত রোগ ভাল হইয়া যাইবে।"

গুরুর কথায় শিষ্যের সমস্ত পরিবার যেন একেবারে হাতে চাঁদ পাইলেন, সকলেই বলিতে লাগিলেন,—"দিন, দিন—ঔষধ দিন।"

গুরু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"তবে ইহার মধ্যে একটু গোল আছে। ঔষধটি প্রথমে একটি লোককে চিবাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর সেই ঔষধ রোগীকে খাওয়াইতে হইবে,—যে ব্যক্তি প্রথম চিবাইয়া দিবে তাহার কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। এইটুকু যা গোল। তবে এই লোকটির ত দেখিতেছি অনেক আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছেন—

একজন না একজন নিশ্চয়ই চিবাইয়া দিতে পারেন। মা কিংবা স্ত্রী ইঁহারা ত নিশ্চয়ই পারেন!”

গুরুর এই কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের কান্না থামিয়া গেল। শিষ্যের মা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—“তাই তো, আমার এই বৃহৎ সংসার—আমি মরিলে এ সকল কে দেখিবে, শুনিবে? অন্য ছেলেগুলিই বা কে প্রতিপালন করিবে? বৌমা, তুমিই না হয় ওটা চিবাইয়া দাও।”

স্ত্রী অমনি বলিয়া উঠিল,—“অদৃষ্টে যা ছিল, হইয়াছে। আমি কি মরিতে পারি? আমার দুই তিনটি নাবালক ছেলে; আমি মরিলে তাহাদের কে দেখিবে?”

শিষ্য এতক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া সমস্তই দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল; সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—একেবারে গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—“গুরুদেব, আপনি যাহা বলিয়াছিলেন সে কথা সত্যই। আর আমি সংসারে থাকিতে চাহি না।” শিষ্য আর তাহাকেও একটিও কথা না বলিয়া সেইদিনই গুরুর সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মানুষের সহিত মানুষের একেবারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা হয় না। নিঃস্বার্থ ভালবাসা একমাত্র ভগবানের সহিতই হওয়া সম্ভব।

লক্ষ্মী-নারায়ণ

বৈকুণ্ঠে নারায়ণ শুইয়া আছেন—লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। হঠাৎ নারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নারায়ণকে হঠাৎ উঠিতে দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, কোথায় যাইতেছেন ?"

নারায়ণ বিশেষ চিন্তিত স্বরে বলিলেন,—"আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়িয়াছে, তাই তাহাকে রক্ষা করিতে যাইতেছি।"

লক্ষ্মীকে এই কথা বলিয়া নারায়ণ বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। নারায়ণকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেন কেন ?"

নারায়ণ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আমার ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হইয়া যে পথ দিয়া যাইতেছিল, সেই পথে ধোপারা কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল। ভক্ত ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কাপড়গুলি একেবারে মাড়াইয়া চলিয়াছিল, তাই ধোপারা লাঠি লইয়া তাহাকে মারার উপক্রম করায় আমি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছিলাম।"

লক্ষ্মী বিস্মিত স্বরে বলিলেন,—"তবে আবার ফিরিয়া আসিলেন কেন ?"

নারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সেই ভক্তটি

ধোপাদের মারিবার জন্য ইঁট তুলিয়াছে দেখিলাম, কাজেই আর আমি গেলাম না।”

নারায়ণের কথার ভাব লক্ষ্মী বুঝিলেন।

যে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, ভগবান তাহাকেই কেবল রক্ষা করেন। যে নিজেকে নিজেই রক্ষা করিব ভাবে, ভগবান তাহার নিকটেও যান না। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম।

পাখী

এক পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপর বসিয়াছিল। জাহাজ গঙ্গা পার হইয়া সমুদ্রের ভিতর আসিয়া পড়িল; পাখীটা যেমন মাস্তুলে বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। জাহাজ যে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, পাখীর সে দিকে একেবারে হুঁশই ছিল না। যখন পাখীর চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিল—চারিদিকে কোথাও কূল-কিনারা নাই; যেদিকে চায় সেই দিকেই জল। পাখী আর এক মুহূর্ত্তও দেরি না করিয়া উত্তর দিকে উড়িয়া গেল, কিন্তু বহুদূর গিয়াও কূল পাইল না, শ্রান্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া মাস্তুলে বসিল। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সে দক্ষিণ দিকে উড়িয়া গেল; সেদিকেও বহুদূর গিয়া কোন কূল-কিনারা পাইল না, আবার শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মাস্তুলে বসিল। এমনি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম,

উত্তর, দক্ষিণ—এক এক বার করিয়া সকল দিকেই ঘুরিয়া আসিল ; কিন্তু কোন দিকেই কোন কূল-কিনারা পাইল না। চারিদিকে অকূল পাথার।

পাখী যখন বুঝিল, কোন দিকেই কূল-কিনারা নাই, তখন সে সেই যে মাস্তুলের উপর বসিল—আর উড়িল না। তখন তাহার আর কোন ব্যাকুলতা রহিল না।

যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণ মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সকল কৌশল সে খাটাইয়া দেখে। নিজের শক্তি নিঃশেষ করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হয়, তখনই সে ভগবান লাভ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণকিশোর

কৃষ্ণকিশোর পরম ধার্ম্মিক—অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দেব-দ্বিজে তাঁহার অসীম ভক্তি। অতি সদাচারে তিনি দিন-যাপন করেন, কাহারও 'ছোঁওয়া, নাড়া' খাদ্য আহার করেন না। গ্রামের লোক কৃষ্ণকিশোরের আচার ও নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ; সকলেই বলে—কৃষ্ণকিশোরের মত এমন সদ্‌ব্রাহ্মণ আজকালকার দিনে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণকিশোরের একবার তীর্থ-ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল,

তিনি তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন-ধাম। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, বৃন্দাবনের ধূলি অঙ্গে মাখিলে ভক্তের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। বৃন্দাবনে আসিয়া কৃষ্ণকিশোর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার জিনিসগুলি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন কৃষ্ণকিশোর ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। তিনি ভগবানের ভাবে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার বেলার দিকে খেয়াল ছিল না। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন সূর্য্য মাথার উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—রৌদ্রের তাপে চারিদিক পুড়িয়া যাইতেছে! তিনি গৃহে ফিরিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এইভাবে কিছু দূর চলিতেই রৌদ্রের তাপে তাঁহার অতিশয় পিপাসা পাইল। জল-পান করিবার জন্য তিনি একটি কূয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি লোক কূয়া হইতে জল তুলিতেছে। তিনি তাহাকে বলিলেন,—"ওহে ভাই, আমাকে এক ঘটি জল দাও না, আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে।"

যে লোকটি জল তুলিতেছিল, সে কৃষ্ণকিশোরের গলায় পৈতা দেখিয়া বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়, আমি আপনাকে কেমন করিয়া জল দিব? আমি যে জাতে মুচি।"

কৃষ্ণকিশোর বলিলেন,—"তার জন্য আর ভাবনা কি!

মুচি তিনবার শিব-নাম উচ্চারণ করিয়া এক ঘটি জল তুলিয়া কৃষ্ণকিশোরকে প্রদান করিল।

তুই এক কাজ কর্‌—তিনবার শিব-নাম উচ্চারণ কর—তাহা হইলেই তোর দেহ শুদ্ধ হইবে; তারপর তুই আমায় জল তুলিয়া দে।”

মুচি তিনবার শিব-নাম উচ্চারণ করিয়া, এক ঘটি জল তুলিয়া কৃষ্ণকিশোরকে প্রদান করিল।

কৃষ্ণকিশোর মহাতৃপ্তির সহিত সেই জল পান করিলেন।

ঈশ্বরের নাম করিলে দেহ-মন শুদ্ধ হইয়া যায়—এ বিশ্বাস যাহার আছে, সেই যথার্থ ভক্ত। এমন বিশ্বাস না থাকিলে কি আর ভগবান লাভ করা যায়?

ভগবানের দান

একজনের ছেলের ভারি অসুখ; কিছুতেই আর সারে না। ডাক্তারও জবাব দিয়া গিয়াছেন। ছেলেটি যে ভাল হইয়া উঠিবে, তাহার কোন লক্ষণই নাই। সেই সময় একজন কবিরাজ আসিয়া বলিলেন,—“স্বাতী নক্ষত্রে যদি বৃষ্টি হয়, আর সেই বৃষ্টির জল যদি মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে, সেই জলে যদি সাপে বিষ ঢালিয়া দিয়া যায় এবং সেই বিষের জলে যদি ঔষধ তৈরী করিয়া তোমার ছেলেকে খাওয়াইতে পার, তাহা হইলে তোমার ছেলে বাঁচিতে পারে।”

লোকটি ছেলেটির জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে স্থির করিল। দিন ও নক্ষত্র দেখিয়া সে ঔষধের সন্ধানে বাড়ী

হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে রাস্তায় চলিতে চলিতে আকুল হৃদয়ে কেবলই ভগবানকে ডাকিতে লাগিল,—"ঠাকুর, আমার ছেলেটিকে বাঁচাও—তুমি যোগাযোগ করিয়া দিলেই হয়।"

সে ঠাকুরকে ডাকিতেছে আর পথ চলিতেছে। চলিতে চলিতে দেখিল—রাস্তার এক পার্শ্বে একটি মড়ার খুলি পড়িয়া রহিয়াছে। মড়ার খুলি দেখিয়া লোকটির ভারি আনন্দ হইল, আকুল কণ্ঠে বলিল,—"ঠাকুর, যখন মড়ার খুলি দেখাইয়া দিয়াছ, তখন এইবার একটু বৃষ্টি দাও।"

সত্য সত্যই একটু পরেই বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল; দেখিতে দেখিতে সেই বৃষ্টির জলে মড়ার খুলিটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সেই লোকটি গদগদ কণ্ঠে আবার বলিল,—"ঠাকুর, মড়ার খুলি দিয়াছ, স্বাতী-নক্ষত্রে বৃষ্টি দিলে, এইবার ইহাতে একটু সাপের বিষ দাও।"

লোকটি আকুলভাবে এই কথা কেবলই ঠাকুরকে জানাইতেছে, সেই সময় সহসা চাহিয়া দেখিল, একটা ব্যাঙ্‌কে একটা সাপ তাড়া করিয়া আসিতেছে; ব্যাঙ্‌কে ছোবল মারিবার জন্য সাপটা ফণা তুলিল, অমনি ব্যাঙ্‌টা সেই মড়ার খুলিটা ডিঙ্গাইয়া পলাইয়া গেলে—সাপের সমস্ত বিষটা সেই মড়ার খুলির মধ্যে পড়িল। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই লোকটা আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, আনন্দে দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে কেবলই বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর, ঠাকুর, তোমার দয়া হইলে সকলই সম্ভব হয়।"

আকুল হইয়া চাহিলে সকলই পাওয়া যায়। মানুষ যখন

এক-মনে কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকিতে থাকে, তখন সে ডাক ভগবানের কর্ণে পৌঁছিবেই পৌঁছিবে।

ঠাকুর, ঠাকুর, তোমার দয়া হইলে সকলই সম্ভব হয়